দাম : বারো টাকা

যত অশান্তি
শান্তিনিকেতনে
— পৃঃ ৪

স্বস্তিকা

জনগণের সঙ্গে সংযোগই
নরেন্দ্র মোদীর সাফল্যের
চাবিকাঠি — পৃঃ ৩৫

৭৩ বর্ষ, ৩ সংখ্যা।। ৩১ আগস্ট, ২০২০।। ১৪ ভাদ্র - ১৪২৭। যুগাব্দ ৫১২২।। website : www.eswastika.com

শ্রীকৃষ্ণজী লহ প্রণাম

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ৩ সংখ্যা, ১৪ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

৩১ আগস্ট - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

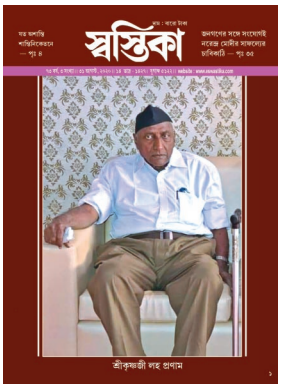

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৩

যত অশান্তি শান্তিনিকেতনে ▯ সুজিত রায় ▯ ৪

সহজ সরল মনের মানুষ শ্রীকৃষ্ণদা ▯ সুনীলপদ গোস্বামী ▯ ৬

মোতলগজী আমার সঙ্ঘকাজের প্রেরণা ▯ অদ্বৈতচরণ দত্ত ▯ ৮

আমাদের মোতগলজী ▯ বিজয় আঢ্য ▯ ১০

আমাদের প্রিয় মোতলগজী ▯ রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ১১

নাগপুরের 'বালুজী' আমাদের 'শ্রীকৃষ্ণদা' ▯ বলরাম দাসরায় ▯ ১২

আমাদের শ্রীকৃষ্ণদা ▯ ডা: শচীন্দ্রনাথ সিংহ ▯ ১৩

সঙ্ঘকাজের প্রেরণা মোতলগজী ▯ প্রদীপ যোশী ▯ ১৪

আদর্শ প্রচারক মোতলগজী ▯ বিজয়গণেশ কুলকার্ণী ▯ ১৫

শ্রীকৃষ্ণরূপী মোতলগজী ▯ বিদ্রোহী কুমার সরকার ▯ ১৬

সন্ততুল্য মোতলগজী ▯ গৌরাঙ্গ দাস ▯ ১৭

শ্রীকৃষ্ণদার প্রয়াণে স্বজন বিয়োগের ব্যথা ▯ গোবিন্দ ঘোষ ▯ ১৭

শ্রীকৃষ্ণজী লহ প্রণাম ▯ রাহুল সিন্‌হা ▯ ১৮

শ্রীকৃষ্ণদার সান্নিধ্যে ▯ ডা: শম্ভুনাথ ধাড়া ▯ ১৯

প্রেরণাস্রোত শ্রীকৃষ্ণ মোতলগজী ▯ রাজু কর্মকার ▯ ২০

কর্মযোগী প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ মোতলগজী ▯ বিদ্যুৎ দত্ত ▯ ২১

শ্রীকৃষ্ণজী অধিকারী ছিলেন না ▯ গৌতম কুমার সরকার ▯ ২১

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ : সংকল্পনা সমূহের স্পষ্টীকরণ ▯ ইন্দুমতী কাটদরে ▯ ২২

পাথর প্রস্তুত, রামমন্দির নির্মাণ শুধু সময়ের অপেক্ষা ▯ দুর্গাপদ ঘোষ ▯ ২৬

বামপন্থীদের ফেসবুক বয়কট : গোয়েবলসীয় প্রচার ছাড়া কিছু নয় ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ২৮

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতে শাসক-সমর্থিত দুষ্কৃতী তাণ্ডব ▯ রামানুজ গোস্বামী ▯ ৩০

বিশ্বভারতী কাণ্ডের উদ্যোক্তা ও সমর্থকদের জন্য রইল শুধু ছিঃ! ▯ মণীন্দ্রনাথ সাহা ▯ ৩২

বেঙ্গালুরুর দাঙ্গা কি পূর্বপরিকল্পিত? ▯ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ▯ ৩৩

জনগণের সঙ্গে সংযোগই নরেন্দ্র মোদীর সাফল্যের চাবিকাঠি ▯ অনুপম খের ▯ ৩৫

বামপন্থা ও জেহাদি মৌলবাদের অত্যাশ্চর্য মিল ▯ ড. তরুণ মজুমদার ▯ ৩৭

কমিউনিস্টরা ভারতের পক্ষে দুষ্ট ক্ষত : নিক্ষিপ্ত হচ্ছে কালের গহ্বরে ▯ ড: আর এন দাস ▯ ৩৮

ড. রাধাকৃষ্ণনের অনুভবে সনাতন হিন্দুধর্ম, সংস্কৃতি ও দর্শন ▯ ড. তরুণকান্তি চক্রবর্তী ▯ ৪১

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

শান্তিনিকেতনকে রক্ষা করিতেই হইবে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুক্তধারা' নাটকে শিবতরাই গ্রামের বাসিন্দারা সর্বদা কান-ঢাকা টুপি পরিধান করিয়া থাকিত। এই কারণেই পরিত যাহাতে বহির্জগতের কোনো শব্দ তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিতে না পারে। এই নাটকেই রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন যে, কান-ঢাকা টুপি পরিবার কুফল এই যে, যেই দিক দিয়া শোনা বন্ধ করা হইবে মৃত্যুবাণটি ঠিক সেই দিক হইতে আঘাত করিবে। রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর সাম্প্রতিক সংকটকালে যাঁহারা উপাচার্যের বিরোধিতা করিতেছেন, তাঁহারা কার্যত কান-ঢাকা টুপি পরিয়া রহিয়াছেন। এবং এই কান-ঢাকা টুপিটি পরিয়া থাকিবার ফলে ইতিমধ্যেই শাসকদলের প্রশ্রয়ে মৃত্যুবাণটি আঘাত হানিয়াছেন। এই কথা সত্য, রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনকে একটি তপোবন রূপে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। উদার প্রকৃতির কোলে মানুষ গড়িবার সাধনস্থল হিসাবেই গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন শান্তিনিকেতনকে। তাহার পর অনেক সময় বহিয়া গিয়াছে। আজ স্বীকার করিতেই হইবে, রবীন্দ্রনাথের সেই স্বপ্নের শান্তিনিকেতনকে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই রক্ষা করিতে পারি নাই। বিগত কয়েক বৎসরে শান্তিনিকেতন প্রাঙ্গণে আইন-শৃঙ্খলার যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পদকটি চুরির মতো কলঙ্কজনক ঘটনাও ঘটিয়াছে। বিশ্বভারতীর ছাত্রী আবাসে হত্যা হইতে শুরু করিয়া নানাবিধ অসামাজিক কার্যকলাপের সাক্ষী গত কয়েক বৎসর হইয়াছে বিশ্বভারতী। বিশ্বভারতীর বহু জমি বেদখল হইয়াছে ইহাও কাহারো অজানা নয়। এতদ্ব্যতীত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর কর্মীর অবাধ দুর্নীতিরও যে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে কলুষিত করিয়াছে তাহাও অন্তত শান্তিনিকেতনের আবাসিক এবং আশ্রমিক সকলেই জানেন। এমতাবস্থায় বিশ্বভারতীকে যদি স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত করিতে হয় তাহা হইলে কিছু কঠোর পদক্ষেপের প্রয়োজন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী সেই কঠোর পদক্ষেপটিই করিয়াছেন। তাহাতে এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদের আঁতে ঘা লাগিয়াছে। তাহারাই রে রে করিয়া ছুটিয়া আসিয়া বিশ্বভারতীতে ভাঙচুর চালাইয়াছেন। সেই আঘাত শুধু শান্তিনিকেতনে লাগিয়াছে তাহা নহে, বাঙ্গালির সাংস্কৃতিক চেতনাতেও সেই আঘাত লাগিয়াছে। যে পাঁচিল তৈয়ারিকে কেন্দ্র করিয়া এত বিতর্ক, তাহা পরিবেশ আদালতের নির্দেশ অনুসারে করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। এবং তাহা কোনো আকাশচুম্বী পাঁচিলও ছিল না। তাহা বিশ্বভারতীর সীমানা নির্ধারণ করিবার জন্য একটি জালের আবরণ নির্মাণ করিবার প্রচেষ্টা ছিল মাত্র।

অবশ্য বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষেরও এক্ষেত্রে কিছু করণীয় কর্তব্য আছে। মনে রাখিতে হইবে, দেশের আর পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিশ্বভারতীর অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। শান্তিনিকেতন একটি আবেগ, একটি স্বপ্ন। অনেক কিছু হারাইয়া গিয়াও অনেক কিছুই এখনো রহিয়া গিয়াছে শান্তিনিকেতনে। ইহা স্মরণে রাখিয়াই বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের উচিত হইবে না অজান্তে শান্তিনিকেতনের আবাসিক এবং প্রবীণ আশ্রমিকদের অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া। কর্তৃপক্ষের উচিত প্রবীণ শ্রমিক ও আবাসিকদের সঙ্গী করিয়া, তাঁহাদের সমর্থন লইয়া শান্তিনিকেতনকে দুষ্কৃতীর লীলাক্ষেত্রে পরিণত করিবার কুপ্রচেষ্টাকে প্রতিহত করা। এবং শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যশালী পৌষমেলাকে আরও সর্বাঙ্গসুন্দর কী করিয়া করা যায়— তাহার উপায় বাহির করা।

সুভাষিতম্

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎপাদং বস্ত্রপূতং পিবেজ্জলম্।
শাস্ত্রপূতং বদেদ্‌বাক্যং মনঃপূতং সমাচরেৎ।।

ভালাভাবে দেখেই সামনে পা রাখা উচিত। জল সবসময় পরিষ্কার কাপড়ে ছেঁকেই পান করা উচিত। কথা সব সময় শাস্ত্রসম্মত হওয়া উচিত এবং আচরণ বিবেকসম্মত হওয়া উচিত।

যত অশান্তি শান্তিনিকেতনে

সুজিত রায়

ভাগ্যিস সত্যজিৎ রায় বেঁচে নেই। না হলে ওই বিশ্ববরেণ্য চিত্র পরিচালককে আজ নির্ঘাত ভাবতে হতো নতুন একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের কথা, যেটির নামকরণ করতে হতো— 'যত অশান্তি শান্তিনিকেতনে'। রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে তৈরি রাঢ় বাঙ্গলার লালমাটিতে জঙ্গলঘেরা 'তপোবন'-এ অশান্তির বীজ বপন হয়েছিল বহু বছর আগেই যখন থেকে বিশ্বভারতী আধুনিক হতে শিখেছে। না, শিক্ষাদীক্ষার আধুনিকতার কথা বলছি না— হাবেভাবে, আচার-আচরণে চালচলনে। তারই ফলশ্রুতি ছিল শান্তির নিকেতনে বামধারার রাজনীতির পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার এক দৃঢ় প্রচেষ্টা। শুধু তাই নয়, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের একটা বড়ো অংশের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারি চাকুরিরত গরিমায় গৌরবান্বিত হয়ে রাবিন্দ্রীক ছত্রছায়ায় সব কিছু অন্যায় ও বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্তি পেয়ে যাবার যে ছাড়পত্র মিলে যেত অতি সহজেই তারই ফলশ্রুতির ষোলো আনা পূরণ হয়েছিল। যখন নোবেল বিজেতা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কারের মেডেল চুরি হয়ে গেল খোদ অন্দরমহল থেকে। তারই মাঝে বারে বারে কখনও গাছ কাটা আবার কখনও কোনো উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল হয়েছে বিশ্বভারতী চত্বর যেখানে সেই সম্মান ফেরাতে শিক্ষিতদের একাংশ ঘরে বসে থাকাই শ্রেয় মনে করে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

সর্বশেষ সমস্যাটা তৈরি হয়েছিল প্রখ্যাত বিজেপি সাংসদ ও সম্পাদক স্বপন দাশগুপ্তের বিশ্বভারতীতে নিমন্ত্রিত হয়ে আসা এবং একটি আলোচনাচক্রে বক্তব্য রাখার অনুষ্ঠানকে ঘিরে। সেদিন কিন্তু বামপন্থী ছাত্র-ছাত্রীরাই সারারাত আটকে রেখেছিলেন বক্তাদের। এবং সাম্প্রাতিকতম গণ্ডগোলটি হলো গায়ের জোরে পাঁচিল ভাঙার কেলেঙ্কারি। অনেকটা সত্যজিৎ রায়ের 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল'-এর মতোই।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯২১ সালে। ১৯৫১ সালে কবি ছিলেন না। কিন্তু ওই সময়েই বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা প্রাপ্তি ঘটে। কবির পুত্র রথীন্দ্রনাথ হয়েছিলেন বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্য। তার অনেক আগেই ১৯০১ সালের ডিসেম্বরে বাংলা ক্যালেন্ডারের ৭ পৌষ ১৩০৮ সালে বোলপুরে শান্তিনিকেতন আশ্রমে রবিঠাকুর একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। নামকরণ করেছিলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মনোবিকাশই ছিল এই বিদ্যালয়ের লক্ষ্য। বিদ্যালয়ের প্রথম পাঁচজন ছাত্রের মধ্যে একজন ছিলেন কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে কবি নিজেই বিশ্বভারতীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ১৯১৮-র ২৩ ডিসেম্বর। উদ্বোধন করেন ১৯২১-এর ২৩ ডিসেম্বর। বাংলার ৮ পৌষ ১৩২৮।

> **শান্তিনিকেতনে অশান্তির মূল সূত্র — হিসাব দেব না। কিন্তু হিসাব বুঝে নেব। পড়াশোনা করব না কিন্তু ছাত্র হিসেবে ইউনিয়নবাজি করব। ক্লাস নেব না। আশ্রমিক হয়ে আঁতলামি করব। চিরকাল কলকাতায় থেকে বুড়ো বয়সে শান্তিনিকেতনবাসী হয়ে রাবীন্দ্রিক হব। ব্রহ্ম কী? ব্রাহ্ম কী? ব্রহ্মসংগীত কাকে বলে? তা শিখব না। কিন্তু 'তপোবন'-এর ধুয়ো তুলব।**

শান্তিনিকেতনে 'পৌষ' শব্দটি ব্যবহার হয় নতুন কিছুর সূচনা হিসেবে। সেই আনন্দেই সূচিত হয়েছিল 'শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা।' ৭ পৌষের মাহাত্ম্য হলো— ওইদিন বাংলা ১২৫০ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথের পিতা) ঠাকুর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। এই উপলক্ষ্যে উৎসব ও মেলার ভাবনাই ছিল তাঁরই। তখন অবশ্য বলা হতো ভুবনডাঙার মেলা। বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের পাশের মাঠই ওই পৌষমেলা প্রাঙ্গণ বলে পরিচিত বহু বছর ধরেই। পরে ১৯৬১ সালে মেলা উঠে আসে পূর্বপল্লীর মাঠে। মেলা মানে একটি আস্ত মেলা— বাদাম ভাজা জিলিপির পাশাপাশি মানুষের মেলা, শিল্পকর্মের মেলা, বইমেলা, গানমেলা, বাউলমেলা, ফকিরদের মেলা— সামগ্রিকভাবে মানুষের মিলনমেলা।

এবার যত অশান্তি ওই মেলার মাঠকে পাঁচিলের ঘেরাটোপে ঘিরে ফেলা নিয়েই। কারণ ওই ঘেরাটোপ নাকি 'তপোবন'-শান্তিনিকেতনের ব্রান্ড ইমেজেই আঘাত হানছে। সেই আঘতটা নাকি হানছেন যিনি তিনি হলেন বিশ্বভারতীর বর্তমান উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ :

১। তিনি সব বিষয়ে এককভাবে সিদ্ধান্ত নেন।

২। তাঁর সিদ্ধান্তগুলি সংশ্লিষ্ট মানুষজনের মতামতবিহীন।

৩। তাঁর সিদ্ধান্তগুলি অগণতান্ত্রিক।

তার চেয়ে বড়ো অভিযোগ :

১। মেলার মাঠ ঘিরে তিনি জনগণকে শান্তিনিকেতন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছেন।

২। মানুষজনের হেঁটে যাওয়ার পথ বন্ধ

করতে চাইছেন।

৩। তিনি পাঁচিল দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঠে বসে আড্ডা দেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছেন।

৪। তিনি ঝুপড়ি রেস্তরাঁ, রতনপল্লীর ভুঁইফোড় দোকান এবং একটি বেসরকারি লজের সামনের গেট বন্ধ করে দিয়েছেন।

৫। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রশ্ন তুলেছেন— আমরা কি আড্ডা দেব না? আমরা কি পড়াশোনার বাইরে একসঙ্গে গানবাজনা করব না?

এ যেন অনেকটা সেই করোনা যুগের প্রথম লকডাউনে চা খেতে বেরনো বৃদ্ধের আকুল প্রশ্ন— 'আমরা কি চা খাবো না? খাবো না চা আমরা?' একদম এক সুর। এক ভাষা।

একটা সহজ প্রশ্ন করি–

শান্তিনিকেতনের জমি জায়গা কার? উত্তর : শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট তথা বিশ্বভারতীর। তা বিশ্বভারতীর জায়গা যদি বিশ্বভারতী ঘিরে পাঁচিল দিয়ে তাতে অন্যের এত গাত্রদাহ কেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন : পাঁচিল দেওয়া যাবে না। কারণ ওখান দিয়ে বিশ্বভারতীর নানা প্রতিষ্ঠানে এবং অফিসে সহজে যাওয়া যায়। আরে বাবা, মাঠ তো মাঠই। রাস্তা মনে করলেই সেটাকে রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করতে দেওয়া যাবে কেন?

তৃতীয় প্রশ্ন : 'তপোবন'-এর ব্র্যান্ড ইমেজ নষ্ট হচ্ছে। ভালো কথা। ভদ্রমহোদয়গণ, একবার সন্ধ্যার শান্তিনিকেতনের নিভৃত ছায়ামাখা চাঁদের আলোমাখা রাস্তায় হেঁটে দেখেছেন? সবুজ ঘাসের গালিচায় রাতের কপোত-কপোতীদের রসলীলা চোখে পড়েছে? সেগুলো এতদিন ধরে কোন ব্র্যান্ড ইমেজ তৈরি করেছে?

চতুর্থ প্রশ্ন : পড়াশোনার ফাঁকে গানবাজনা করবেন। ভালো তো। করুন না। শান্তিনিকেতনে ওই পৌষমাঠের মেলা ছাড়া আর কোনও জায়গা মিলল না?

পঞ্চম প্রশ্ন : উপাচার্য খারাপ লোক। মেনে নিলাম। তার জন্য বিশ্বভারতীর সম্পত্তি নষ্ট করতে হবে? একটু বাড়াবাড়ি রকমের আবদার হয়ে গেল না?

ষষ্ঠ প্রশ্ন : মেলার মাঠের ঝুপড়ি রেঁস্তরা তুলে দেওয়া হয়েছে। দেবে না কেন? জবর দখলি স্বত্বকে প্রামাণিক দলিলে পরিণত করতে হবে কোন আইনে?

আসল কথা হলো— শান্তিনিকেতন মানেই মৌরসিপাট্টা গেড়ে বসার এক দুর্বিনীত অঞ্চল। হয়তো এটাই সত্যি, বিদ্যুৎ চক্রবর্তী সেই মৌরসিপাট্টা বন্ধ করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। প্রাচীন কিছু 'আশ্রমিক' থেকে শুরু করে 'প্রেমিক-প্রেমিকা' ছাত্র-ছাত্রী এবং অবশ্যই 'গাইয়ে-বাজিয়ে' বামপন্থী ছাত্ররা হাতে হাত মিলিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গাইতে চেয়েছিলেন— 'উই শ্যাল ওভারকাম'। আপত্তিটা সেখানেই। সেই 'জন আন্দোলনে' হাত মিলিয়েছিলেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বও। নাহলে তো 'জনগণ' ওদের ওপর দোষ চাপাতে যে বিজেপির এক্সটেন্ডেজ ভার্সান। ভোট কাটা যেত সব। সামনেই নির্বাচন। এসব রিস্ক নেওয়া যায়? অতএব একটু বেশি রোয়াব দেখিয়েই ভেঙে দাও বিশ্বভারতীর ঐতিহ্যপূর্ণ সুদৃশ্য তোরণসজ্জা জেসিবি চালিয়ে।

লক্ষ্যণীয় যা তা হলো--- গোটা আন্দোলনটাই ১৫ মিনিটের আন্দোলন। বিশ্বের ইতিহাসে জনআন্দোলনের ক্ষুদ্রতম সংস্করণ। লক্ষ্য কী ছিল? পাঁচিল ভাঙা। 'ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও' স্লোগানের সঙ্গে কোথাও একটা মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? গোটা আন্দোলনের সূত্র ওই একটাই--- ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও।

পশ্চিমবঙ্গে এখন উৎসব হয়। বামফ্রন্ট করত খুব উৎসব। জেলায় জেলায়। ব্লকে ব্লকে। এখন তৃণমূল সরকার করছে— ইলিশ উৎসব, আম উৎসব, পিঠে উৎসব ইত্যাদি। আমফানের ঝড়ে অতিক্রান্ত সুন্দরবনবাসী পেটে কিল মেরে পড়ে থাকে। টাকা খায় দাদারা। কথা বললে পিঠে কিল পড়ে।

সংস্কৃতি শব্দটার মধ্যে সংহতি শব্দটা আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। সংহতি মানে একত্রিত হওয়া, দৈহিক নয়, সামাজিক মিলন। বঙ্গের সংস্কৃতি এখন হলো— রাস্তার ট্র্যাফিক সিগন্যালে মমতা-সংগীত বাজা। মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গসংস্কৃতির মানে হলো লক্ষ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগার থেকে সরিয়ে পাঁচ টাকার পিঁয়াজি দশ টাকায় বিক্রি করা এবং সে হিসাব কোনোদিন না মেলানো।

শান্তিনিকেতনে অশান্তির মূল সূত্র সেটাই। হিসাব দেব না। কিন্তু হিসাব বুঝে নেব। পড়াশোনা করব না কিন্তু ছাত্র হিসেবে ইউনিয়নবাজি করব। ক্লাস নেব না। আশ্রমিক হয়ে আঁতলামি করব। চিরকাল কলকাতায় থেকে বুড়ো বয়সে শান্তিনিকেতনবাসী হয়ে রাবীন্দ্রিক হব। ব্রহ্ম কী? ব্রাহ্ম কী? ব্রহ্মসংগীত কাকে বলে? তা শিখব না। কিন্তু 'তপোবন'-এর ধুয়ো তুলব।

আর কত? আলগা রাশের দিনগুলোতে যা করার করেছ। এবার একটু শৃঙ্খলিত হলো অনুশাসন। অমল ও দইওয়ালার গল্প শুনিয়ে কিংবা অচলায়তনের কাহিনি বিবৃত করে শৃঙ্খলার চরম সর্বনাশ করে ছাড়ব— তা বোধহয় কোনো প্রতিষ্ঠানই কোনোদিন মেনে নেবে না। মেনে নেওয়া উচিতও নয়। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলেও মানতেন না।

মুখ্যমন্ত্রী তো চব্বিশ ঘণ্টা বলছেন— আইন আইনের পথে চলবে। আইন নিজেদের হাতে তুলে নেবেন না। শান্তিনিকেতনে কী হলো মুখ্যমন্ত্রী সাহেবান? কেউ জবাব দেবেন না জানি। কারণ জবাব দেওয়ার দায় যাঁদের তাঁরাই এতদিন 'তপোবন'কে বেলেল্লাপনার জতুগৃহ করে তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের দোহাই দিয়ে রবীন্দ্রনাথেরই আদ্যশ্রাদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। বিশ্বস্তরে তো পরের কথা। সামাগ্রিকভাবে সর্বভারতীয় স্তরে মান প্রতিবছর নীচের দিকে নামছে বিশ্বভারতীর। কেন এই হাল? একবারও আওয়াজ উঠবে না— ষড়যন্ত্রকারীদের কালো হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও? ■

সহজ সরল মনের মানুষ শ্রীকৃষ্ণদা

সুনীলপদ গোস্বামী

আজ সন্ধ্যাবেলা শ্রীকৃষ্ণদার স্মরণ সভায় থাকতে হবে ভেবে সকাল থেকেই মনটা খুব ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। ১৯৮১ সাল, আমাদের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ ছিল মালদাতে। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগের কথা। আমরা জানলাম, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সহ-প্রান্ত প্রচারক হিসেবে শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ আসছেন। একটা বৈঠক ছিল, সেই বৈঠকে মোরপন্তজীও উপস্থিত ছিলেন। মোরপন্তজীর উপস্থিতিতেই সেই বৈঠকে ঘোষণা হলো শ্রীকৃষ্ণদার সহ প্রান্ত প্রচারক হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে আসার কথা। তিনি রঙে ও চেহারায় একেবারে দক্ষিণ ভারতীয়দের মতো মতো ছিলেন। অনেক সময় বলতেন, 'দেখো পশ্চিমবঙ্গে আমার কালো রং-টা একটু উজ্জ্বল হয়ে গেছে।' আমি যখন জেলা প্রচারক ছিলাম, আমাদের যখন প্রচারক বর্গ হতো, সেই বর্গে আমি একটা গান গাইতাম। সেই গান ছিল— 'সকলই তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।' যখনই এই ধরনের বৈঠক হতো, তখনই তিনি পেছন থেকে বলতেন, 'সুনীল ওই সকলই তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি— গানটা গাও'। এরকম

'ওই গানটা গাও' বলার লোক তিনি চলে গেলেন। তিনি লম্বা সময় আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণদা যখন কলকাতায়, আমরা সবাই একসঙ্গে ২৬ নম্বর সঙ্ঘ কার্যালয়ে থাকতাম। সেখানে ওপেন বাথরুম, ওই ২৬ নম্বরে চৌবাচ্চা থেকে জল নিয়ে স্নান করা। ঠাণ্ডা জল। শ্রীকৃষ্ণদা বলতেন, 'দেখো সবাই ঠাণ্ডা জলে স্নান করছে, আমি তো ভেবেই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যে কী করে ঠাণ্ডা জলে স্নান করে। সেই শ্রীকৃষ্ণদাই কিন্তু এখানকার ভাষা শিখলেন, খাওয়া শিখলেন। ওই ঠাণ্ডা জলে স্নান করতেও শুরু করলেন। বলতেন, যদি অমলদা(অমল কুমার বসু) স্নান করতে পারেন তো আমিও স্নান করতে পারি।

১৯৮৫ সাল, কেশব ভবন তৈরি হবে। সেই ভবনের নকশা শ্রীকৃষ্ণদা তৈরি করেছিলেন। সেই আর্কিটেক্ট চলে গেলেন। ১৯৮৫ সালে আমি নদীয়া বিভাগ প্রচারক ছিলাম। আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। পায়ে ব্যথাও ছিল। ওই অবস্থাতেই আমি কেশব ভবনের ভূমিপূজাতে এসেছিলাম। এই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরস। এসেছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী। আমরা সমস্ত প্রচারকরা ছিলাম ওখানে। সেই কার্যক্রমের পর আমাদের প্রচারক বর্গ ছিল গোড়কবংশীতে, দমদমের কাছে। সমস্ত প্রচারকদের নিযুক্তির ঘোষণা হচ্ছে সেই ঘোষণার সময় আমাদের প্রান্ত প্রচারক ছিলেন কেশবজী। সবার নাম ঘোষণা করা হচ্ছে, তখন মোতলগজী পেছন থেকে বলছেন, কলকাতা মহানগরের ঘোষণাটা করলেন না? তখন আমার ঘোষণা হলো। তখন আমি জানতে পারলাম, আমি নদীয়া থেকে কলকাতায় এলাম । আমার ও শ্রীকৃষ্ণদা দুজনেরই কেন্দ্র ২৬ নং বিধান সরণীর কার্যালয়। একসঙ্গে ২৫ বছর ২৬ নম্বরকে কেন্দ্র করে কলকাতায় থাকা— এটা অনেকের জীবনে হয়েছে কিনা জানি না, আমার জীবনে হয়েছে। সেই জন্য খুব কাছ থেকে তাঁকে দেখেছি।

আমি যখন মহানগর প্রচারক ছিলাম তখন তিনি আমাকে স্কুটারে বসিয়ে শাখাভিত্তিক প্রবাস করতেন। প্রথম পরিচয়ের জন্য প্রবাস করাতেন। একটা জিনিস লক্ষ্য করতাম, তাঁর যে আন্তরিকতা, প্রত্যেক বাড়িতে যাওয়ার পর সেখানে পরিবারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যে কথাবার্তা বলা— সেটার একটা বিশেষ স্টাইল ছিল। মনে আছে রামশিলা পূজনর সময় সারা কলকাতা জুড়ে খুব গণ্ডোগোল হচ্ছিল। তখন পথনির্দেশের কাজটা কলকাতায় বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণদা করেছিলেন। আমাকে বলেছিলেন, তুমি এখন ৩৩ নম্বরে চলে যাও। আমি মনে মনে ভাবলাম, ৩৩ নম্বরে যেতে বলছেন মানে হয়তো আমাকে

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দায়িত্ব দেওয়া হবে। আমি গেলাম, সম্পূর্ণ রামশিলা পূজন কার্যক্রম শেষ করে অযোধ্যায় শ্রীরামশিলা পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত পুরোটাতে আমি ৩৩ নম্বরে ছিলাম। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণদা আমাদের পথনির্দেশ করতেন।

১৯৯২ সালের কল্যাণী মহাশিবিরের প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণদার কথা না বললে অপূর্ণ থেকে যাবে। সারা ভারতবর্ষের লোকেরা প্রথম দেখল যে কলকাতার কাছে কল্যাণীতে এত বড়ো মহাশিবির এবং এই মহাশিবিরের প্রস্তুতিতে ৩ মাস ধরে নিরন্তর সেখানে যাওয়া। এসবের পথনির্দেশ তিনি করেছিলেন। কল্যাণী মহাশিবিরের যে প্রস্তুতি, আমরা যে এত বড়ো মহাশিবির করতে পারলাম, তার ব্যবস্থাপনায় তিনি খুব সুন্দর দক্ষতার পরিচয় রেখেছিলেন। এরকমই কেশব ভবনের দ্বার উদ্ঘাটনের সময় আমরা অনুভব করেছি। সেখানে সারা ভারতের অনেক কার্যকর্তা এসেছিলেন যেমন, বালাসাহেব দেওরস, রজ্জু ভাইয়া, সুদর্শনজী, যাদবরাওজী যোশী— যাঁদের নাম নতুন স্বয়ংসেবকদের হয়তো জানা নেই, তাঁদের সমস্ত ব্যবস্থাপনা পর্দার আড়ালে থেকে শ্রীকৃষ্ণদা করেছিলেন। তিনি পরবর্তীকালে ২০০৩ সালে যখন ক্ষেত্র প্রচারক হলেন এবং পরে অখিল ভারতীয় সহ-প্রচারক প্রমুখ হলেন, তখন আমাদের প্রদেশ রচনার কিছু পরিবর্তন হয়ে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ দুটি প্রান্ত হয়। এই ঘোষণার আগে তিন জায়গায় বড়ো কার্যক্রম হয়েছিল। একটা রায়গঞ্জে, একটা দুর্গাপুরে, একটা কলকাতায়। ২০০০ সাল থেকে এমন পরিকল্পনা চলছিল যেভাবে প্রদেশে কাজ বাড়ছে তাতে দুটো ভাগ করা হবে না তিনটে ভাগ, তার জন্য তিন জায়গায় তিনটি বড়ো কার্যক্রম হয়েছিল। সুদর্শনজী তখন সরসঙ্ঘচালক। তিনি তিনটি কার্যক্রমেই উপস্থিত ছিলেন। ২০১২-তে আবার কল্যাণীতে শিবির হয়েছিল। এই শিবিরেও তিনি ১৯৯২ সালের কল্যাণী শিবিরেব মতো আর্কিটেক্ট ছিলেন। তিনি ২০১২-তে সেই শিবিরে তিনি ছিলেন। আমাদের দুজনেরই খুব আনন্দ হচ্ছিল। প্রায় ২০-২২ বছর পর আবার এত বড়ো এক যুব শিবির স্বামীজীর জন্ম সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে হয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণদার শরীর তখন ঠিক ছিল। পরবর্তীকালে কেন্দ্রের নির্দেশে তিনি চলে গেলেন নাগপুরে। কিন্তু তাঁর মনটা এই পশ্চিমবঙ্গ ও অসমেই পড়ে থাকত। শেষের চার বছর তিনি অনেক সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে এসেছেন, বিভিন্ন কার্যক্রমে এসেছেন। তিনি যেসব জায়গায় কাজ করেছেন সেখানে বাড়িতে বাড়িতে যাওয়া, থাকা, খোঁজ-খবর নেওয়া সবই করতেন। আন্তরিক ভাবে তিনি সবার সঙ্গে মেলামেশা করতেন।

তাঁর শারীরিক অবস্থা খারাপ প্রথম দেখলাম ২০১৮ সালে গোয়ালিয়র প্রতিনিধি সভার বৈঠকে। আমি দেখা করতে গিয়ে দেখলাম, যে শ্রীকৃষ্ণদাকে ৪০ বছর আগে দেখেছি সেই শ্রীকৃষ্ণদা এখন নিজে কোথায় যাবেন, কীভাবে যাবেন— এগুলো খুব চিন্তা করছেন। তাঁর একা নাগপুরে যাবার টিকিট হয়েছিল। কিন্তু তাঁর শরীর খুবই খারাপ থাকায় একজন কার্যকর্তার সঙ্গে তাঁকে নাগপুরে পাঠানো হয়েছিল। ২০১৯ সালে নাগপুরে জুন মাসে তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা। আমি যখন দেখা করতে গেলাম তিনি বললেন, 'আগের থেকে শরীরটা নরম হয়ে গেছে, আর বেশি হাঁটাচলা করতে পারি না।' তখন তাঁর সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়নি শ্রীকৃষ্ণদা এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন। শ্রীকৃষ্ণদার শেষ সময়ের কথাটা মনে পড়ছে। এই লকডাউনে কে কোথায় আছি, অনেক কার্যকর্তাই খোঁজ নিতে ভুলে গেছেন। হঠাৎ মার্চের শেষের দিকে আমি তখন চেন্নাই কার্যালয়ে ছিলাম, শ্রীকৃষ্ণদা ফোন করে বলছেন, 'সুনীল, তুমি কোথায় আছো?' আমি বললাম—' আমি এখন চেন্নাই কার্যালয়ে আছি, এখানে লকডাউনে আটকে আছি। আপনি কেমন আছেন?' তিনি বললেন, 'আমি এখন ভালো আছি, আগের থেকে শরীরটা ভালো আছে।' তারপর আর ফোন করার সুযোগ হয়নি। ইচ্ছে করেই করিনি। কার্যকর্তারা বলছিলেন তাঁর ফোন ধরতে একটু অসুবিধে হয়। কে বলছে, কোথা থেকে বলছে এটা তিনি বুঝতে পারতেন না। তাই তিনি কেমন আছেন— এটা এধার-ওধার কাছ থেকে খোঁজ নিতাম। রামদার (রামচন্দ্র সহস্রভোজনী) কাছে শুনলাম— 'একদিন শ্রীকৃষ্ণদা রাত্রি দুটোর সময় দরজার সামনে হামাগুড়ি দিয়ে এসে ধাক্কা মারছেন, দরজা খুলে দেখলাম, শ্রীকৃষ্ণদা মাটিতে বসে আছেন। বলছেন আমি উঠতে পারছি না, আমাকে উঠিয়ে দাও।' রামদা তাঁকে ধরে তুললেন এবং ঘরে পৌঁছে দিলেন। পরবর্তীকালে তিনি হাঁটতেন কিন্তু শরীরের দুর্বলতা ছিল।

চার-পাঁচদিন আগেই নাগপুরে ফোন করেছিলাম। রামদা বললেন, 'এখন ভালো আছেন। তুমি কি কথা বলতে চাও? বলতে পারো, কিন্তু তিনি সবসময় ফোন ধরেন না।' আমি হয়তো সেদিন ফোন করলেই তাঁর সঙ্গে শেষবারের মতো কথা হতো। হঠাৎ চারদিন পর সবাই যেমন খবর পেল, আমিও খবর পেলাম—আমাদের সবার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণদা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। শ্রীকৃষ্ণদা চলে যাওয়ায় আমার একটা কথা মনে পড়ছে— 'এনেছিলে সঙ্গে করে মৃত্যুহীন প্রাণ, মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান'। শ্রীকৃষ্ণদাকে প্রণাম, কোটি কোটি প্রণাম।

(লেখক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কেন্দ্রীয় কার্যকারিণীর আমন্ত্রিত সদস্য)

মোতলগজী আমার সঙ্ঘকাজের প্রেরণা

অদ্বৈতচরণ দত্ত

এই সময়ে যাঁরা আমার মতো সঙ্ঘকাজের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের প্রত্যেকের জীবনেই মোতলগজীর কিছু না কিছু প্রভাব আছে। প্রত্যেকেই অনুভব করছেন তাঁর জীবনীশক্তিকে। তিনি কেমন মানুষ ছিলেন, একটা কথা মনে পড়ছে— 'বৃত্তপত্রমেঁ নাম ছপেগা প্যাহেনুঙ্গা সাগর সম হার / ছোড় চলেঁ য়হ ক্ষুদ্র ভাবনা হিন্দু রাষ্ট্রকে তারণ হার।' আর একটি মর্মকথা আছে— 'তেরা বৈভব অমর রহে মাঁ হম দিনচার রহেঁ না রহেঁ'। একথা স্বয়ংসেবক, কার্যকর্তা, প্রচারক প্রত্যেকের কর্মপথের পাথেয়। মোতলগজী ঠিক এটাই ছিলেন— যাকে বলে প্রসিদ্ধিপরাঙ্মুখ। বহু বছর তিনি পশ্চিমবঙ্গ, অসমে অর্থাৎ সঙ্ঘের দৃষ্টিতে যাকে আমরা পূর্বক্ষেত্র বলি, সেই ক্ষেত্রে কাজ করেছেন, তেমনই সঙ্ঘকাজের তীর্থভূমি নাগপুরে অনেক বছর কাটিয়েছেন। তাসত্ত্বেও আমরা কোনোদিন তাঁকে দেখিনি নিজেকে অতিরিক্ত উচ্চতায় স্থাপন করতে।, বরং নিজেকে অতি সাধারণ, অতি সামান্য করে রেখেছেন। কারণ তিনি প্রসিদ্ধি পরাঙ্মুখ। সঙ্ঘকাজ করা ও কার্যকর্তা তৈরি করাই ছিল তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। আমাদের প্রত্যেক কার্যকর্তার তাঁর থেকে এই কর্মপ্রেরণা গ্রহণ করা উচিত।

মোতলগজীর জীবন গীতোক্ত সেই উচ্চ আদর্শের ওপর অধিষ্ঠিত। সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয় ও লাভালাভে তিনি কোনোদিন বিচলিত হতেন না। তিনি অখিল ভারতীয় স্তরে প্রচারকদের জন্য ভ্রমণ করতেন। আজকের নবীন প্রচারকরা আমাদের মতো প্রবীণ প্রচারকদের দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁকে দেখেছে। নিছক কালের গণ্ডিতে তাঁকে বাঁধা যাবে না। তিনি কালোত্তীর্ণ। সন্তরা বলেন, গীতার কথাগুলো হলো তত্ত্বমূলক, কিন্তু মোতলগজী সেই তত্ত্বকথা আমাদের জীবনে ব্যবহারিক ভাবে কার্যকরী করেছেন। এরকম এক মহান প্রচারককে আমরা হারালাম যাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল একটাই — সঙ্ঘকাজ।

তিনি যে পরিবারে বড়ো হয়েছেন সেই পরিবার থেকে প্রচারক বের হওয়া নির্ধারিতই ছিল, কিন্তু কে বের হবেন— তাঁর দাদা না তিনি, সেই নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁরই জয় হয়েছিল। তাঁর দাদা চেন্নাইয়ে বহু বছর কাটিয়েছেন, সেখানে অধ্যাপনা করতেন। তাঁর ভাইঝি একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক। যেদিন মোতলগজী পরলোকে পাড়ি দিলেন, সেদিন পরম পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক মোহনজীর ফোন

১৯৮৭ সালে উত্তরবঙ্গের প্রচারকরা তৎকালীন জলপাইগুড়ি জেলা কার্যবাহ সুকুমার দে'র বাড়িতে। সঙ্গে আছেন সরকার্যবাহ শেষাদ্রিজী, প্রান্ত কার্যবাহ সুনীলবরণ মুকোপাধ্যায়, প্রান্ত প্রচারক শ্রীকৃষ্ণরাও মোতলগজী।

পেলাম। তিনি আমাকে বাংলাতেই বললেন, 'অদ্বৈতদা, মোতলগজী চলে গেলেন।' অকস্মাৎ এই সংবাদে আমি বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। একটু সামলে নিলে নিয়ে একটা কথাই মোহনজীকে জিজ্ঞেস করলাম, ' তাঁর ডাক্তার ভাইঝি শেষ সময়ে কাছে ছিলেন কি না।' মোহনজী বললেন, 'হ্যাঁ, ছিলেন।' আমি আশ্বস্ত হলাম, কারণ শেষ সময়ে সেই ডাক্তার ভাইঝি তাঁর সেবা করেছেন। পরম শান্তিতে তিনি পরম ধামে গমন করতে পেরেছেন।

জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও তিনি সচল ছিলেন। প্রয়াত হবার একদিন আগ্যে তিনি কার্যালয় থেকে ডাক্তারের চেম্বারে গিয়েছিলেন। তাই আমরা বলতে পারি, তিনি সজ্ঞানেই অমৃতলোকে যাত্রা করেছেন। আমরা করোনা আবহে ভার্চুয়াল শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা করছি। ঈশ্বরের ইচ্ছাও বোধ হয় তাই— তিনি যে প্রসিদ্ধিপরাঙ্মুখ। লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে তাঁর কাজ করার বহু নমুনা আছে। অসমের দুর্গম এলাকায় কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁর অমানুষিক পরিশ্রমের কথা কোনোদিন কাউকে বলেননি।

আমার তাঁকে প্রথম দেখার দিনটির কথা মনে আছে। ১৯৮১

সালে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ থেকে তিনি প্রচারক বেরিয়ে নাগপুরে ছিলেন। নাগপুর থেকে তাঁকে অসমে পাঠানো হয়েছিল। ডিব্রুগড় বিভাগ প্রচারক, গৌহাটি মহানগর প্রচারক হিসেবে বেশ কয়েক বছর কাজ করার পর শ্রীগুরুজী তাঁকে মায়ের অসুস্থতার কারণে নাগপুরে থেকে সঙ্ঘের কাজ করতে বলেন। তিনি নাগপুরে ফিরে যান। তখন নাগপুর আলাদা প্রান্ত হিসেবে ঘোষিত ছিল। তাঁকে নাগপুর প্রান্ত প্রচারক ঘোষণা করা হলো। কলকাতায় যখন এলেন, দেখলাম কত বিশাল তাঁর কর্মক্ষেত্র। আমি বিদর্ভ প্রান্তে প্রচারক বৈঠকে গিয়েছিলাম। মোতলগজীর সঙ্গে আমি শ্রীরাম যোশীর বাড়িতে গিয়েছি। দেখলাম, শ্রীরাম যোশীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব।

নাগপুরে তিনি বালুজী নামে পরিচিত। আমরা তাঁকে কেউ শ্রীকৃষ্ণজী, কেউ মোতলগজী বলি। বেশিরভাগ স্বয়ংসেবক শ্রীকৃষ্ণদা বলেন। নাগপুরে তাঁর সম্পর্ক প্রতিটি স্বয়ংসেবক, প্রতিটি কার্যকর্তার ঘরে ঘরে। নাগপুরে তিনি বহু কার্যকর্তা নির্মাণ করেছেন। একদিন কার্যালয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম যে, কার্যালয়ে থেকে পড়াশোনা করা বিদ্যার্থীদের কার্যকর্তা রূপে তৈরি করা যায় কি না। অনেকে বলেছিলেন কার্যালয়ে যে বিদ্যার্থীরা থাকেন তাদের সেভাবে দেখাশোনা করা হয় না, ফলে তাদের মধ্যে সংস্কারও কিছু জন্মায় না। আমি উৎসাহ প্রাকাশ করেছিলাম, কার্যালয়ে যদি দু'তিন জন বিদ্যার্থী থাকেন তাদের উন্নতি অবশম্ভাবী। যদি আমাদের অধিকারীরা তাদের ভালোভাবে গড়ে নিতে পারেন, তবে আমরা আগামীদিনে অনেক ভালো কার্যকর্তা পেতে পারি। তখন আমি আমার জীবনের প্রসঙ্গে বললাম আমিও কার্যালয়ে থেকে পড়াশোনা করেছি। তখন মোহনজী বললেন, 'ঠিক কথা, মোতলগজী আমাকেও কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে এসেছিলেন।' আজ তিনি সরসঙ্ঘচালক। মোতলগজীর হাতের স্পর্শ পেয়েছিলেন সেকথা স্মরণ করে তিনি গর্ব অনুভব করেন। মোতলগজীর হাতের ছোঁয়া যারা পেয়েছেন তারা অনেক দূর এগিয়ে যেতে পেরেছেন। মোহনজী তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তিনি এরকমই ছিলেন একটি শক্তিকেন্দ্র। ৬ আগস্ট দিনটা আমাদের কাছে বড়োই বেদনার। আজকের দিনে খ্রিস্টান প্রভাবিত জঙ্গি সংগঠন এনএলএফটি সঙ্ঘের চার কার্যকর্তাকে অপহরণ করে। মোতলগজী তখন ক্ষেত্র প্রচারক, আমি সহ প্রান্ত প্রচারক। আমি প্রত্যক্ষদর্শী— তিনি যন্ত্রণায় কতটা কাতর হয়েছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে শান্ত সমাহিত চিত্তে তাঁদের মুক্তির জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন। যত রকম প্রয়াস নেওয়া সম্ভব তিনি নিয়েছিলেন। তাদের মুক্তির জন্য যতটা অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব তা তিনি করেছিলেন। আশ্চর্য হতে হয়, কী অসীম ধৈর্যশক্তির সঙ্গে তিনি সেই দিনগুলিতে কাজ করেছিলেন। সমস্ত রকম চেষ্টা সত্ত্বেও শেষ রক্ষা হয়নি। সেই চারজন কার্যকর্তার আত্মা নিশ্চয় শান্তি পাবে সবাই সেই প্রার্থনা করি। সেসময় সেই চার কার্যকর্তার পরিবারের ধৈর্যচ্যুতি ঘটা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু মোতলগজী শান্তচিত্তে তাঁদের কথা শুনতেন। কোনোদিন তাঁকে উত্তেজিত হতে দেখিনি। তিনি তাঁদের পরিবারের বেদনা ভাগ করে নিতেন।

তাঁর সঙ্গে কাজ করার সুবাদে আমি কত কিছু শিখেছি। আমি তখন কোচবিহার জেলা প্রচারক। তিনি প্রবাসে এসেছেন। একজন কার্যকর্তা স্কুটার কিনেছেন, যেটা আমি চালাবার চেষ্টা করছি। আমরা সবাই জানি, মোতলগজী স্কুটার চালাতে পারেন। তাঁর পাকা হাত। আমি একেবারে নতুন। তিনি ক্রমাগত আমাকে উৎসাহ দিয়ে চলেছেন। আমি চালাচ্ছি, তিনি পেছনে বসে। মাঝে মাঝে ব্রেক কষতে হচ্ছে, স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তিনি আমাকে হতোদ্যম না করে উৎসাহ দিয়েছেন। আমার জেলা প্রচারক থেকে অখিল ভারতীয় দায়িত্ব, আমার স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই, এই যাত্রাপথ তিনি মসৃণ করে দিয়েছেন।

২০০৩ সালে যখন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত ঘোষণা হলো, আমাকে তখন প্রান্ত প্রচারকের দায়িত্ব নিতে বলা হয়। এর পিছনে যে মানুষটির প্রেরণা ছিল তিনি মোতলগজী। তিনি যখন পশ্চিমবঙ্গে এলেন, তখন মূলত কলকাতা ও হাওড়া মহানগরের কাজ দেখতেন। ধীরে ধীরে সহ প্রান্ত প্রচারক, প্রান্ত প্রচারক, ক্ষেত্র প্রচারক হলেন। তাঁর কাছে শুনেছি, যখন তিনি এখানে এসেছিলেন তখন খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপারে তাঁকে অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। বাঙ্গালি বাড়িতে তাঁকে মাছ খেতে দিত, আজীবন নিরামিষাশী মানুষটি মাছ খেতেন, তবে কাঁটা বাছতেন দুই হাত দিয়ে। বলতেন— দেখো, অভ্যাসে মানুষ সবই পারে, আমি মাছ না খেলে ওরা দুঃখ পাবেন। তিনি বললেন, আমি জানতাম অসমে গিয়ে আমার খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন করতে হবে। তাই ট্রেনে নাগপুর থেকে গৌহাটি যাওয়ার সময় ডিম খাওয়ার অভ্যাস করেছিলাম। তাঁর এই সমর্পিত জীবনের থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, আমাদের যে ক্ষেত্রে যেতে হবে সেখানকার উপযোগী হতে হবে। এই শিক্ষাটা আমাদের প্রচারকদের মস্ত পাওনা তাঁর কাছ থেকে। তাঁর মৃত্যুর পর অসম থেকে যে অসংখ্য ফোন আসছিল তাতে বুঝতে পারি যে অসমবাসীরা স্বজন হারানো বেদনা অনুভব করছেন। কোনো কার্যকর্তা বলতে পারবেন না যে তাঁর সঙ্গে মোতলগজীর কথা কাটাকাটি হয়েছে। বিভিন্ন কার্যালয় প্রমুখের কাছে শুনেছি মোতলগজী সামান্য কাজে বাইরে গেলেও বলে যেতেন।

মোতলগজী তাঁর উচ্চ দায়িত্বের জন্য আলাদা কোনো সুযোগ গ্রহণ করেননি। প্রত্যেকটি অনুশাসন তিনি পালন করতেন। ২০০৩ থেকে ২০১০ পর্যন্ত তিনি ক্ষেত্র প্রচারক চিলেন। তারপর অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ ছিলেন, তারপরে দু'বছর কার্যকারিণীর সদস্য ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি শান্ত সমাহিত চিত্তের মানুষ। কেশব ভবনে তিনি মাঝে মাঝে আমার ঘরে আসতেন, জিজ্ঞেস করতেন, প্রচারক বৈঠক কবে। আমি তাঁকে ডায়েরি খুলে বলে দিতাম। মাঝে মাঝে তাঁর ঘরেও আমাকে ডেকে পাঠাতেন — ইন্টারকমে অত্যন্ত কুণ্ঠা সহকারে বলতেন, 'পাঁচ মিনিটের জন্য আমার ঘরে একটু আসবে?' আমি ঠিক সময়ে তাঁর ঘরে পৌঁছে যেতাম।

তাঁর সমস্ত কাজ থেকে প্রেরণা নিয়ে তাঁর অসমাপ্ত কাজ যদি আমরা করতে পারি তবে সেটাই হবে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য। অসমে যখন তিনি ছিলেন তাঁন তাঁর কাছে শুনেছি রাস্তাঘাটের কী শোচনীয় অবস্থা ছিল, যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না, বাস নেই, ট্রেন নেই, তার মধ্যেও তিনি সেখানে সঙ্ঘকাজের বিস্তার করতে পেরেছিলেন, জেলায় জেলায় স্থানীয় ভাবে কার্যকর্তা তেরি করেছিলেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা— তাঁর আত্মা সাধনোচিত ধামে গমন করুক।

(লেখক অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ)

আমাদের মোতলগজী

বিজয় আঢ্য

স্বস্তিকার এক অনুষ্ঠানে মহাজাতি সদনে মোতলগজী ও সুদর্শনজী।

শ্রীকৃষ্ণরাও মোতলগ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একজন প্রচারক। সঙ্ঘের প্রচারক পদ্ধতি এমনই যে যেখানে কাজ, কাজের দায়িত্ব বা কাজের ক্ষেত্র কোনওটাই ব্যক্তির ইচ্ছাধীন নয়। গত প্রায় পঁচানব্বই বছর ধরে এরকম শত শত প্রচারক রয়েছেন যাঁরা সঙ্ঘের পরামর্শ মতো সম্পূর্ণ জীবনই স্বদেশ ও সমাজের কাজে আত্মোৎসর্গ করে গিয়েছেন, কিন্তু রয়ে গেছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। পশ্চিমবঙ্গেও ভিন্ন রাজ্য থেকে এমন বহু প্রচারক এসেছেন, এমনকী প্রায় সারা জীবন বাঙ্গলাতেই কাটিয়েছেন, কিন্তু এখন বিস্মৃতপ্রায়। মোতলগজী— তিনি এই নামেই পরিচিত ছিলেন। বাঙ্গলায় বহু বছর কাটিয়ে জীবনের শেষ প্রান্তে নাগপুরে ফিরে গিয়েছেন। সেখানে খুব বেশিদিনের ব্যবধানে নয়, শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। এদিক থেকে তিনি এক 'আত্মলোপী' মানুষ।

মোতলগজীর সঙ্গে পরিচয় প্রায় ৫৫ বছরের বেশি সময়ের, ১৯৬৩ সালে সঙ্ঘের প্রথমবর্ষ শিক্ষা বর্গে যোগ দিতে গিয়ে। বর্ধমানের মোহন্ত স্থলে অনুষ্ঠিত বাঙ্গলা-অসম প্রদেশের যৌথ ওটিসি-তে (সঙ্ঘশিক্ষা বর্গ) অসম থেকে তিনি শিক্ষক হিসেবে এসেছিলেন। সঙ্গী শ্রী শশীকান্ত চৌথাইওয়ালে— যিনি তাঁরই মতো একজন প্রচারক এবং এখন অসমেই রয়েছেন। এরপর আবার দেখা হয় ১৯৬৯-তে নাগপুরে তৃতীয় বর্ষে গিয়ে। তখন নাগপুর সঙ্ঘের একটা প্রদেশ হিসেবে গণ্য হতো। তিনি তখন নাগপুরের প্রান্ত প্রচারক। নাগপুরে তাঁর পরিচিতি 'বালুজী' নামে। বর্তমান সরসঙ্ঘচালক ছিলেন সেই বর্গে একজন শিক্ষক হিসেবে। সেসময় একবার মোতলগজীর মাতৃদেবীকেও দেখে এসেছিলাম তাঁর স্কুটারের পেছনে চেপে। আমাদের প্রদেশের প্রবীণ প্রচারক বিজয় কুলকর্ণী তাঁর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে অনেক কথাই বলতে পারবেন। কেননা, তাঁদের দুই পরিবারের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল।

এরপর মালদায় সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে (১৯৮১ সাল), হঠাৎ একদিন দেখি--- মোরপন্ত পিংলেজীর সঙ্গে মোতলগজী এসেছেন। এবং বাঙ্গলার সহ-প্রান্ত প্রচারক হিসেবে। ভালোই লাগল পুরানো পরিচয়ের একজন মানুষকে পেয়ে। সেই থেকে বছরখানেক আগে পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়েছে।

মোতলগজী ছিলেন মিতবাক। তবে তিনি রসকষহীন ছিলেন এমন বলা যাবে না। কোনও অসুবিধে বুঝলে তিনি মজা করে বলতেন, এটা আমাদের প্রিন্সিপ্যাল, পলিসি নয়। আর ব্যবহারেও কোনও দেখনদারি ভাব ছিল না। অথচ মন জুগিয়ে চলার মতো তিনি মানুষ ছিলেন না। সঙ্ঘের আদর্শের প্রতি কতটা 'কমিটমেন্ট' বা নিষ্ঠা তা তিনি খতিয়ে দেখতে পিছপা হতেন না। একজন কার্যকর্তা অমরনাথ তীর্থ দর্শনে যেতে চাইলে প্রত্যুত্তরের জন্য তিনি কয়েকদিন অপেক্ষা করতে বললেন, পরে আবার জিজ্ঞাসা করলে এখন না যাওয়াই ভালো বলে জানালেন। কার্যকর্তাটির অবশ্য যাওয়ার খুবই ইচ্ছা ছিল, যাওয়ার ব্যবস্থাও প্রায় পাকা করে ফেলেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর কথা মেনে নিয়েছিলেন। আবার এরকম একজন মানুষের সংস্পর্শে এসে আমরা যাকে 'লোফার' বলি, তারও কেমন 'উত্তরণ' ঘটে, সেটাও প্রত্যক্ষ করেছি। বহু পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল বাড়ির একজনের মতোই। একবার এক স্বয়ংসেবকের ফ্ল্যাট কেনার মতো বিষয়েও তিনি মধ্যস্থতা করেছিলেন।

তাঁর জীবনের একটা বড়ো বেদনাদায়ক ঘটনা— বিশেষত বাঙ্গলা ও অসম নিয়ে যে ক্ষেত্র, তার ক্ষেত্র প্রচারক হিসেবে। ত্রিপুরায় চারজন স্বয়ংসেবকের অপহরণ ও হত্যা। শ্যামলকান্তি সেনগুপ্তের পরিবারের সঙ্গে

তাঁর সম্পর্ক ছিল সেই শিলচর থেকেই। সুধাময় দত্তকে স্বস্তিকা দপ্তর থেকে আগরতলা বিভাগ প্রচারক হিসাবে নিযুক্তি, তাঁরই তত্ত্বাবধানে হয়েছিল। তাঁর কার্যকালে বাঙ্গলা ও অসম দুই প্রদেশেই শাসক দল ছিল বিরোধী আদর্শের। শুধু আদর্শের নয়, শত্রুতারও। এসবের মোকাবিলা করে সঙ্ঘের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কতটা 'কণ্টাকাকীর্ণ', তা সহজেই অনুমেয়। সাধারণত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব বলতে যা বোঝায়, চেহারা, চাল-চলন, পাণ্ডিত্য, এক কথায় চোখে পড়বার মতো তেমন কিছু তাঁর ছিল না। তবুও তিনি যে আমাদের মনে একটা দাগ রেখে গেলেন তা তার আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা গুণে। এখানেই তাঁর মহত্ত্ব, এখানেই তিনি প্রণম্য।

(লেখক প্রবীণ প্রচারক তথা স্বস্তিকার পূর্বতন সম্পাদক)

শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ স্মরণে

আমাদের প্রিয় মোতলগজী

রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ইতিহাসে নাগপুরের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। রত্নপ্রসবিনী নাগপুর। নাগপুরের অন্যতম একটি রত্ন শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ গত ২ আগস্ট রবিবার রাত ৮-৪৫ মিনিটে অমৃতলোকে গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

আমার সঙ্গে মোতলগজীর পরিচয় ১৯৬২ সাল থেকে। ৬২ সালে আমার সঙ্ঘের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষা হয়। মোতলগজী আমার শিক্ষক ছিলেন। দীর্ঘ বছরের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। মেধাবী ছাত্র ছিলেন। নাগপুরের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। নাগপুরে বালুজী নামে পরিচিত ছিলেন। বি.ই. সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে সঙ্ঘের প্রচারক হন। তখন নাগপুর শহরকে একটি প্রান্তের মর্যাদা দেওয়া হতো। মোতলগজী নাগপুর প্রান্ত প্রচারক ছিলেন। পরে তিনি অসমে প্রচারক হিসেবে যান। প্রথমে বিভাগ প্রচারক পরে অসমের প্রান্ত প্রচারকের দায়িত্ব পালন করেন। অসমে সঙ্ঘ কাজের বিস্তারে মোতলগজীর অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। অসম থেকে তিনি পশ্চিমবঙ্গে আসেন। এখানে সহ-প্রান্ত প্রচারক, পরে প্রান্ত প্রচারকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মনে প্রাণে বাঙ্গালি হয়ে গেছিলেন। অনায়াসে বিশুদ্ধ বাংলায় ভাষণ দিতেন। তখন পশ্চিমবঙ্গ ও অসম নিয়ে ছিল পূর্বক্ষেত্র। তিনি ক্ষেত্র প্রচারকের দায়িত্ব পেলেন। গৌহাটি তাঁর কেন্দ্র হলো। ক্ষেত্র প্রচারক হিসেবে তাঁর অন্যতম বড়ো কাজ অসমের কার্যকর্তা শ্যামল সেনগুপ্তকে কলকাতায় নিয়ে আসা। শ্যামলদা ছিলেন উচ্চ কোটির গৃহী কার্যকর্তা। তিনি কলকাতা মহানগর কার্যবাহ এবং পরে ক্ষেত্র কার্যবাহের দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করছিলেন। মোতলগজী ক্ষেত্র প্রচারক থাকাকালীন তাঁর কেন্দ্র ছিল গৌহাটি। সেই সময় আগরতলায় একটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা ঘরে। ক্ষেত্র কার্যবাহ শ্যামল সেনগুপ্তের প্রবাস ছিল আগরতলায়। আগরতলায় তিনি কাঞ্চনছড়ায় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের ছাত্রাবাস পরিদর্শনে যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আগরতলার তিনজন প্রবীণ প্রচারক— দীনেন দে, সুধাময় দত্ত ও কাঞ্চন চক্রবর্তী। ছাত্রাবাস থেকে খ্রিস্টান উগ্রবাদীরা (এনএলএফটি) এই চারজন কার্যকর্তাকে তুলে নিয়ে যায় এবং প্রায় দু-বছর ধরে বিভিন্ন জঙ্গলে লুকিয়ে রেখে নির্মম ভাবে হত্যা করে। তখন আগরতলায় সিপিএমের সরকার। তারা এদের উদ্ধারের কোনো চেষ্টা করেনি। কেন্দ্রের বাজপেয়ী-আদবাণীর সরকারও এদের উদ্ধারে ব্যর্থ হয়। মোতলগজী এদের উদ্ধারের জন্য সর্ববিধ প্রয়াস করেছেন। ওই সময় কলকাতায় মোতলগজীর সঙ্গে বহুবার দেখা হয়েছে। তাঁর চিন্তাক্লিষ্ট বেদনাক্লিষ্ট চেহারা দেখেছি। এই চারজন কার্যকর্তার নির্মম হত্যাকাণ্ডের বেদনা মোতলগজী আমৃত্যু বয়ে বেড়িয়েছেন।

মোতলগজী মৃদুভাষী, সরল অনাড়ম্বর জীবনের অধিকারী ছিলেন। আমি কখনও তাঁকে রাগতে দেখিনি। কলকাতার কেশব ভবন' নির্মাণে মোতলগজীর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অসুস্থ অবস্থায় তিনি নাগপুরের কেন্দ্রীয় কার্যালয় হেডগেওয়ার ভবনে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ঈশ্বরের দেওয়া মনুষ্যজীবন তিনি ঈশ্বরীয় কাজেই সমর্পণ করেছিলেন। পঞ্চভূতে বিলীন তাঁর পার্থিব শরীর। তাঁর আত্মার প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই।

(লেখক পূর্বতন ক্ষেত্র কার্যবাহ)

নাগপুরের ‘বালুজী’ আমাদের ‘শ্রীকৃষ্ণদা’

বলরাম দাসরায়

দেশে জরুরি অবস্থা উঠে যাবার পর ১৯৭৮ সালে তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের জন্য নাগপুর গিয়েছিলাম। বর্গ উদ্বোধন হবার পরের দিন চর্চাগটের কালাংশে শ্রীকৃষ্ণদাকে প্রথম দর্শন করার সুযোগ পেয়েছিলাম। নাগপুরের প্রান্ত প্রচারক বালুজী চর্চাপ্রবর্তক হিসেবে আমাদের চর্চাগটে চর্চা নিতে এসেছিলেন। প্রচারকদের ওই চর্চাগটে বর্তমান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও শিক্ষার্থী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণদা কত কঠিন বিষয় কত সহজভাবে চর্চাগটে বিশ্লেষণ করতেন। সেই বর্গে অসম ও মণিপুর হতে ৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিল। হিন্দিতে কথা বলা তাঁদের পক্ষে কষ্ট হতো, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণদা তাঁদের মুখ থেকেও চর্চা বিষয়ের উপর বিন্দু বের করে আনতে নানান পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন। কারণ তাঁদেরকেও তাঁদের প্রান্তে একটি সর্বভারতীয় সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে।

এরপর সম্ভবত ১৯৮১ সাল, কোচবিহারের জেলা প্রচারক হিসেবে মালদহ বর্গে অংশগ্রহণ করেছি, দেখলাম সেই মানুষটি আমাদের সহ-প্রান্ত প্রচারক হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন। কাছে গিয়ে প্রণাম করতেই বললেন, কী বলরাম কেমন আছো। বুঝলাম বঙ্গপ্রদেশে কাজ করতে হবে বলে ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতে শুরু করে দিয়েছেন।

পরবর্তীকালে আমার সুন্দরবন জেলা প্রচারক হিসেবে দায়িত্ব থাকাতে মাঝে মাঝেই ২৬ নং নিবাসে আসতাম। শ্রীকৃষ্ণদার কাজের ও আপনত্বের ভাব কতটা গভীরে সেটা অনুভব হতো। সর্বদা স্বয়ংসেবকদের উপর সংস্কারের ছাপ ফেলতে তৎপর থাকতেন। ২৬ নং নিবাসে কোনোদিনই প্রথম পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করতেন না, বেশি আগ্রহ করলে বলতেন, তোমরা হলে আজকের বিশেষ অতিথি, সুতরাং তোমরা প্রথম পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করবে। সেই সময় কয়েকদিন ২৬ নং নিবাসে অসুস্থ হয়ে শ্রীকৃষ্ণদার ঘরেই চিকিৎসার জন্য ছিলাম, খাওয়ার রুচি না থাকার জন্য শ্রীকৃষ্ণদা নিজের হাতে বাটি নিয়ে আমাকে জোর করে খাওয়াতেন। কারণ জেলা প্রচারককে শীঘ্র সুস্থ হয়ে কার্যক্ষেত্রে ফিরতে হবে।

যখনই তাঁকে জেলাতে প্রবাসের জন্য আগ্রহ করতাম, না বলতেন না। বর্ষাকাল, দক্ষিণ শেহরদহ (ডায়মন্ড হারবার) গ্রামের শাখার বনভোজন ছিল। এই গ্রামেরই স্বয়ংসেবক ছিল কাঞ্চন চক্রবর্তী, ত্রিপুরাতে যে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণদা বনভোজনে উপস্থিত ছিলেন। বনভোজনের শেষে হাঁটাপথে শেহরদহ গ্রামে ফিরতে হয়, কারণ ওই গ্রামেই শ্রীকৃষ্ণদার রাত্রিবাস ঠিক করা ছিল।

তিনি যখন ক্ষেত্রপ্রচারক হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে অসমে এসেছিলেন তখন আমি ধুবড়ী বিভাগ প্রচারক। অসম, ত্রিপুরা, মণিপুর সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণদা বিস্তৃতভাবে প্রবাস করেছিলেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলের সকল কার্যকর্তাদের খুব নিকট থেকেই তিনি দেখেছেন এবং সেখানকার কার্য বৃদ্ধিতে সর্বদা পরামর্শ দিয়েছিলেন। অসমের

১৯৮৮ সালে ত্রিপুরা রওনা হবার দিন শ্রীকৃষ্ণদার সঙ্গে বলরাম দাসরায়।

সঙ্ঘকাজের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্য করে বিভাগ অনুসারে প্রবাস করেছিলেন। যুব কার্যকর্তাদের বৈঠকে সময় সমর্পণের জন্য উৎসাহ দিতেন। এর পরিণাম স্বরূপ ৫০ জন প্রচারক নতুন করে বেরিয়েছিল। সেই ব্যাচেরই প্রচারক মানিক চন্দ্র দাস, পরবর্তীকালে উত্তর অসম প্রান্তের প্রান্ত প্রচারকের দায়িত্ব পালন করেন। কুমুদ বটঠাকুর, একজন সিনিয়র শিক্ষকও তাঁর আহ্বানে প্রচারক বের হন। আজ আমরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের যে পরিবর্তন দেখছি তার প্রেরণাকেন্দ্রে যাঁদের নাম আছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ। অখিল ভারতীয় অধিকারী হিসেবে সুদর্শনজী উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণদা সেই কাজকেই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

সাত রাজ্যকে নিয়ে অসম ক্ষেত্রের প্রতিটি প্রান্তের সঙ্ঘকাজকে সুদৃঢ় করার জন্য অনেকবার তিনি বিস্তৃতভাবে প্রবাস করেন। আমার শিলচর বিভাগের প্রচারক দায়িত্ব পাওয়ার পর শ্রীকৃষ্ণদার একবার প্রবাস ছিল। ব্যবস্থার বিষয়ে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ অসম্পূর্ণ ছিল, সেসব কাজ দ্রুত সম্পূর্ণ করার আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

নবীনদের কাজ শিখাতে সব ধরনের প্রয়োগ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। বাল্যকাল থেকে স্বয়ংসেবক হিসেবে শুনে আসছি, তামিলনাড়ু, অসম, তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলে কাজের বিষয়ে বলা হতো, Hard nut to crack, সেই সব স্থানেও Ice breaking-এর কাজ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণদা।

সঙ্ঘের প্রথম ৩০-৪০ বছর প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তারজী, শ্রীগুরুজী ও বালাসাহেবজী যে ধরনের কার্যকর্তা তৈরি করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণদা তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর সান্নিধ্য যারা পেয়েছিলেন তারা সেটা অনুভব করেছেন। শ্রীকৃষ্ণদার অকৃত্রিম ভালোবাসা ও আপনত্ব বোধের জন্য পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্বয়ংসেবকদের বাড়ির সদস্যরা আজও শ্রীকৃষ্ণদাকে মনে রেখেছেন। তাঁকে আমার শত শত প্রণাম। পরম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, শ্রীকৃষ্ণদার অমর আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

হে মহাজীবন তুমি কোটি কোটি অন্তরে
শুভ চেতনার দীপ যাও জ্বালিয়ে।

(লেখক পূর্ব ক্ষেত্র বৌদ্ধিক প্রমুখ)

শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ স্মরণে

আমাদের শ্রীকৃষ্ণদা

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ সিংহ

শ্রীকৃষ্ণদা আমাদের মধ্যে নেই। তিনি চিরশান্তির পথে বিরাজমান হয়েছেন। ব্যক্তি তো অমর নয়, তাঁকে এক সময় চলে যেতেই হবে। এটাই স্বাভাবিক। মৃত্যু আছে বলেই জীবনের আনন্দ। তবুও এমন কিছু ব্যক্তি থাকেন যাঁর চলে যাওয়ায় আমাদের মন বিচলিত হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ মোতলগজী তেমনই একজন ছিলেন। তিনি এমন একজন প্রচারক ছিলেন যাঁর লক্ষ্য ছিল 'ওয়ান লাইফ ওয়ান মিশন'। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পর নাগপুর থেকে সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে বের হন। জীবনের সব চেয়ে স্বর্ণিল সময় পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের সঙ্ঘ কাজে নিয়োজিত ছিলেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব— প্রান্ত প্রচারক, ক্ষেত্রপ্রচারক, অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখের দায়িত্ব সামলে শেষের দিকে বছর চারেক আগে নাগপুর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে চলে যান এবং সেখানেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কয়েকবছর আগে একটি কেন্দ্রীয় বৈঠকের পর আমরা নাগপুর কার্যালয়ে শ্রীকৃষ্ণদার সঙ্গে দেখা করতে যাই। নাগপুর কার্যালয় তখন সুরক্ষার ঘেরাটোপে বন্দি। আমরা যথাযোগ্য নিয়ম পালন করে কলকাতা থেকে এসেছিসমর্পণ শ্রীকৃষ্ণদার সঙ্গে দেখা করতে চাই বলে অনুমতি পেলাম। তখন তিনি বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। বিছানার পাশে বসে অনেক কথা হলো। পুরাতন পরিচিতদের খোঁজ খবর নিলেন। কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তাঁর কলকাতা আগমন উপলক্ষ্যে ফেরার পথে মুম্বই দূরন্ত এক্সপ্রেসে নাগপুরের আগে ট্রেনে অনেক কথা হয়। শেষের দিকটায় আর বেশি দেখা হয়নি। কিন্তু ২৫-৩০ বছর বিভিন্ন সময় নানান ঘটনার সাক্ষী থেকেছি। অনেক কথা মনে পড়ছে। ভারাক্রান্ত মনে সব কথা লেখা যায় না। আমরা যখন জুনিয়র প্রচারক ছিলাম, জেলা/বিভাগের দায়িত্ব ছিল, তখন তিনিও আমাকে অনেক কাছ থেকে দেখেছেন। অনেক বছর এক সঙ্গে প্রবাস করেছি। তাঁর যেমন ব্যক্তিত্ব ছিল, তেমন দৃষ্টিতে ছিল গাম্ভীর্য। তাঁকে বিব্রত অবস্থায় দেখেছি যখন ত্রিপুরায় আমাদের বঙ্গপ্রদেশের চারজন কার্যকতার অপরহরণ হয়। তদানীন্তন সরকার, স্বয়ংসেবক এবং সমাজের আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের নাগরদোলায় কার্যকর্তাদের যোগ্য পথনির্দেশ তিনি শান্ত ভাবে করেছেন। তিনি সব সময় নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। একটা কথা শ্রীকৃষ্ণদা বলতেন, 'মাত্র এক বছরের জন্য সঙ্ঘের প্রচারক হয়ে বেরিয়েছিলাম, প্রতি বছর এক্সটেনশন করতে করতে কবেই যে প্রচারক জীবনের ৫০ বছর পেরিয়ে গেল তা বুঝতেই পারলাম না'।

এইরকম নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণদা। এটাই হলো প্রচারকের গুণ– সমর্পণ, মন সমর্পণ এবং জীবন সমর্পণ।

(লেখক বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যকর্তা)

সঙ্ঘকাজের প্রেরণা মোতলগজী

প্রদীপ যোশী

শ্রীকৃষ্ণজীর এভাবে হঠাৎ চলে যাওয়া আমাদের সকলকে এক গভীর আঘাত করে গেছে। সঙ্ঘকার্য করার সময় প্রথমবার শ্রীকৃষ্ণজীর নামের সঙ্গে পরিচয়। সামনাসামনি পরিচয় অনেক পরে। নাগপুরে সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ চলার সময় প্রথমবার দেখা হয়। সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের ব্যবস্থার দায়িত্বে নিমগ্ন হয়ে থাকতে দেখা যেত তাঁকে।

এর পরে কল্যাণীতে সঙ্ঘের মহাশিবিরের কথা মনে আসে। তখন শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যায়। প্রচণ্ড প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সঙ্ঘের কাজ দাঁড় করানো কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা আজ বুঝতে পারি। সুদর্শনজীর সহায়ক হিসেবে অসম ক্ষেত্রে পৌঁছে, সেখানকার তদানীন্তন পরিস্থিতির নিরিখেও শ্রীকৃষ্ণজী ঠিক কেমন ভাবে কাজ করছেন তা স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারতাম। মণিপুরের সেই ভয়াবহ আতঙ্কের পরিবেশেও সঙ্ঘের পবিত্র জ্যোতিকে রক্ষা করার গুরুদায়িত্বও তিনি খুব সহজেই পালন করতে পেরেছেন।

স্থানীয় ভাবে সঙ্ঘের কাজ দাঁড়ক এবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণজীর সর্বদা আগ্রহ থাকত। মণিপুরে মতো প্রান্তে তাঁর একক প্রচেষ্টায় ৭-৮ জন করে স্থানীয় বিস্তারক বের হতে শুরু করে। সঙ্ঘকার্য খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পেতে পারে এই বিশ্বাস আমি তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি।

সমগ্র অসম ক্ষেত্রের সঙ্ঘকার্যকে সঠিক দিকে পরিচালন করতে তিনি বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। সময়ের নিরিখে তা সঠিক পদক্ষেপ ছিল। প্রতিক্রিয়ার বদলে সঙ্ঘের ভূমিকা ঠিক কতটা গঠনমূলক ও রচনাত্মক হওয়া প্রয়োজন, এটিই তাঁর বৌদ্ধিকসমূহের মূল বিষয় হয়ে থাকত। সেই সময়কালের যেসব যুবক কার্যকর্তা 'ক্রিয়ার পরিবর্তে প্রতিক্রিয়া' এই মতবাদের বদলে সঠিক পদ্ধতিতে সঙ্ঘকে জানার ও বোঝার চেষ্টা করেন, তাঁরাই বর্তমানে অসম ক্ষেত্রের সম্পূর্ণ পরিবর্তনের নেপথ্যে রয়েছেন। এর পিছনে শ্রীকৃষ্ণজীর অবদান অনস্বীকার্য।

আমি যখন অরুণাচল প্রদেশে সঙ্ঘকাজে যাই, তখন এই পথনির্দেশই আমি তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি। প্রথম দিক থেকেই স্থানীয় কার্যকর্তাদের দ্বারা সঙ্ঘকার্যকে বৃদ্ধি করে এগিয়ে চলার প্রচেষ্টা সেই দিশারই অঙ্গ। পাহাড়ি অঞ্চলে অনেক বিবিধতা থাকে, আবার কিছু অহংবোধও থাকে। সুতরাং স্থানীয়ভাবে কাজ হোক, আলাদা প্রশিক্ষণ বর্গ হোক বিষয়ে আমরা সবাই

শ্রীগুরুজীর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে সকলের সঙ্গে মোতলগজী।

বিশেষভাবে যত্নশীল থাকতাম। মোতলগজী স্বয়ং নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাস করে কার্যকর্তাদের এবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করতেন।

শ্রীকৃষ্ণজী যখন পশ্চিমবঙ্গে আসেন তখন এখানে কমিউনিস্ট শাসন চলছে। গণতন্ত্র বিরোধী, হিন্দু বিরোধী এবং দেশবিরোধী বিচারধারা সমগ্র সমাজে প্রবলভাবে বিস্তার করেছে। জরুরি অবস্থার পরে সমগ্র দেশব্যাপী স্বাভিমানের ঢেউ উঠতে শুরু করে, যা কালক্রমে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে দিন বদলের সূচনা করে। এই সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে এমন অনেক আন্দোলন শুরু হয়, যার ফলে পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। সবার মনে তখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠতে শুরু হয় যে ,পশ্চিমবঙ্গে কী ঘটতে চলেছে? মোতলগজী জানতেন যে, পশ্চিমবঙ্গে এই পরিবর্তন বাকি দেশের মতো স্বাভাবিক হবে না। কিন্তু দেশব্যাপী যে আন্দোলনের ঢেউ উঠেছিল, সেই ঢেউকে সমগ্র বাঙ্গালি সমাজের কাছে এক অনন্ত শক্তিধারা রূপে পৌঁছে দেওয়ার পবিত্র কাজে তিনি নিজেকে যুক্ত করেন। এর ফলস্বরূপ জরুরি অবস্থাকালীন আন্দোলন, একাত্মতা রথযাত্রা, রামমন্দির আন্দোলন প্রভৃতি নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের স্বাভিমান জাগরণ ক্রমাগত বেড়ে চলতে থাকে। আজকের দিনে আমরা সেদিনের সেই জাগরণকে দৃপ্তপদে এগিয়ে যেতে দেখার অনুভব করছি। আজকের বঙ্গসমাজের স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে রামনবমী উৎসব পালন এবং তাতে অংশগ্রহণ– এই দীর্ঘ যাত্রার একটি ছোটো উদাহরণ মাত্র। এখন দিনের আলোর মতো স্পষ্ট যে, হিন্দুত্বের নবজাগরণে পশ্চিমবঙ্গ আর পিছিয়ে থাকবে না।

কার্যক্ষেত্রে সমাজের ক্লেশ দূরীকরণ, তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজকে এমন শক্তিশালী করে তোলা, যাতে কোনোরূপ ক্লেশের চিহ্নমাত্র না আসে। আর তাই হবে সমাজের জন্য নিবেদিত শ্রেষ্ঠ কর্ম। সঙ্ঘের এই চিন্তাধারাকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ শ্রীকৃষ্ণজী সারাজীবন করে গেছেন। পরম পূজনীয় ডাক্তারজীর পথে চলতে শুরু করা প্রতিটি মানুষ এক অখণ্ড সংকল্পমন্ত্রে দীক্ষালাভ করেন, যে মন্ত্র সারাজীবনের মতো তাঁর চলার পাথেয় হয়ে দাঁড়ায়--

লক্ষ্য প্রাপ্তির বলিবেদী 'পরে
তন মন সবই ঢালো
শক্তি থাকুক ভরপুর প্রাণে,
হৃদয়ে আগুন জ্বালো।।

(লেখক পূর্ব ক্ষেত্র প্রচারক)

শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ স্মরণে

আদর্শ প্রচারক মোতলগজী

বিজয়গণেশ কুলকার্ণী

শ্রদ্ধেয় শ্রীকৃষ্ণ ভগবন্ত মোতলগজী নাগপুরে বালুজী নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি একধারে যেমন আমার আত্মীয়, অন্যদিকে আমার ৫১ বছরের প্রচারক জীবনের প্রেরক, মার্গদর্শক ও অভিভাবক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে আমি অত্যন্ত শোকাহত।

১৯৬৯ সালে বালুজী নাগপুর প্রান্ত প্রচারক ছিলেন। সেই বছর নাগপুর থেকে আমি একমাত্র প্রচারক বেরিয়েছিলাম। বালুজী আমার দাদাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন এবং আমাদের বাড়িতে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করতেন, যার জন্য আমি তাঁর সহচর্য পেয়েছি। তাঁর মা একজন ধর্মপ্রাণা সাধ্বী মহিলা ছিলেন। আমি তাঁর দর্শন পেয়েছি। মোতলগজীর বড়দা ও মেজদার সঙ্গে আমার ভালো পরিচয় ছিল। প্রচারক বেরোনোর পর আমার প্রচারক জীবন পশ্চিমবঙ্গে শুরু হলো এবং তা এখন পর্যন্ত চলছে। বালুজী ১৯৮১ সালে পশ্চিমবঙ্গে সহ-প্রান্ত প্রচারক হিসেবে আসেন। কিছুদিন পর পূর্বাঞ্চল ক্ষেত্র প্রচারক হন। এই সুবাদে তাঁর সঙ্গে আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হলো। প্রায়ই তাঁর কাছে আমি যেতাম এবং সুপরামর্শ পেতাম এবং এমনকী আমার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধান তিনি করতেন। আমার কাছে তিনি সর্বদাই 'বালুজী' ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ত্রিপুরা, অসম ইত্যাদি স্থানে মোতলগজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হতো। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের প্রতি তাঁর যে অকৃত্রিম স্নেহ তা সবাইকে আকৃষ্ট করেছিল। মোতলগজীর সঙ্ঘ কাজের একটি বিশেষ দিক বলা যেতে পারে বিবিধ ক্ষেত্রের কার্যকর্তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনে তাঁর উদ্যম। আমি কখনও কখনও বলতাম যে মোতলগজী হচ্ছেন 'সমন্বয় মহর্ষি'। মোতলগজীর কাছে বসলে তিনি আমাকে দিয়ে তাঁর কাছে আসা অনেক চিঠির উত্তর লেখাতেন, তার মধ্যে অসমের একজন সংস্কৃত শিক্ষকের মৃত্যু সংবাদের উত্তর লিখতে গিয়ে আমি চিঠিটি সংস্কৃতে লিখলাম। চিঠি পেয়ে তাঁরা মোতলগজী সংস্কৃতও জানেন এই দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছিলেন। মোতলগজী কার্যকর্তাদের চারটি সূত্র বলতেন যথা— প্যায়র মেঁ চক্কর, মু মেঁ শক্কর, দিল মেঁ আগ, সির মেঁ বর্ফ। আর এই সূত্র অনেক কার্যকর্তা বহুবার উল্লেখ করেছেন।

কয়েক বছর আগে মোতলগজী যখন নাগপুরে সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয়ে স্থায়ী থাকার জন্যে চলে গেলেন তখন সেখানেও আমি অনেকবার তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি। আমার লেখা বইও তাঁকে দিয়েছি। তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল নাগপুরে ২০১৯-এর ২৩ মে, যেদিন লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছিল । পশ্চিমবঙ্গের ফল শুনে তিনি যারপরনাই খুশি হয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তাঁর অন্তরের টান ছিল, মনে হয় তার জন্যেই আমাকে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, তুমি হাওড়াতে কেন্দ্র করে থাকো । আমি হাওড়ায় এসেছি এই সংবাদ দেওয়ার পর তিনি খুশি হয়েছিলেন। মোতলগজী আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর স্মৃতি আমাকে সর্বদা প্রেরণা জোগাবে। ভগবানের কাছে তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি। শ্রীকৃষ্ণ শরণম্ মমঃ।

(লেখক বিদ্যাভারতীর দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রচারক)

শ্রীকৃষ্ণরূপী মোতলগজী

বিদ্রোহী কুমার সরকার

তাঁতিবেড়িয়ায় সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে মোতলগজী।

শ্রীকৃষ্ণের মতো সমস্ত দৈবীগুণের অধিকারী না হলেও মোতলগজীর মধ্যে দৈবীগুণের প্রভাব লক্ষণীয়। তিনি যেভাবে আমার বা আমাদের সামনে এসেছেন তাতেই তাঁর গুণের বহিঃপ্রকাশ দেখা গেছে। তিনি ছিলেন মিতভাষী, মিষ্টভাষী, বিচক্ষণ, লোককে বুঝানোর ক্ষমতার অধিকারী। দৃষ্টি ছিল মর্মভেদী এবং দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সদর্থক। ফলে সাধারণ অনাড়ম্বর জীবন ছিল তাঁর (অবশ্য এটা প্রচারক মাত্রেরই গুণ)। প্রতি পদক্ষেপে অভিজ্ঞতার ছাপ ছিল। মনে হয় তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল সহজাত। এগুলি যে অতিশয়োক্তি নয় তাঁর প্রমাণ তাঁর সান্নিধ্যে যখনই এসেছি তখনই পেয়েছি। এমনকী তাঁর রসিকতাও ছিল মাধুর্যপূর্ণ ও শিক্ষণীয়।

একবার কলকাতার বৈঠকে (তখন প্রান্ত ভাগ হয়নি) আমরাও এসেছিলাম। বৈঠকে হঠাৎ গোবিন্দাচার্যজী (তখন বিজেপি-র দায়িত্বে) এলেন। তাঁকে মঞ্চে মোতলগজীর পাশেই বসানো হলো। গোবিন্দাচার্যজীর গায়ের রং কুচকুচে কালো। পরিচয়ের পরে গোবিন্দাচার্য চলে গেলেন। তখন মোতলগজী বললেন— 'আমি এতক্ষণ ফর্সা ছিলাম, আবার কালো হয়ে গেলাম।' হয়তো অনেকেরই মনে আছে, কিন্তু সেই কথা আমি ভুলতে পারিনি।

তখন সরকার্যবাহ ছিলেন শেষাদ্রীজী। তাঁর পত্র অনুসারে আমরা জনজাগরণ অভিযান চালাব। আমরা কলকাতার বৈঠকে। তৎকালীন বিজেপি সভাপতি বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী আমাকে কেশব ভবনে গণেশদার (দেবশর্মা) ঘরে নিয়ে গেলেন। তাঁর সামনেই শাস্ত্রীজী বললেন, 'তপন শিকদার মালদায় দাঁড়াবে, তোমরা দেখো। যা খরচ হবে আমি দেব।' আমি রাজি হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই দেখি মোতলগজী দাঁড়িয়ে, তাঁর মর্মভেদী দৃষ্টি আমার দিকে। বললেন কী কথা হলো? আমি বললাম সব। জিজ্ঞেস করলেন টাকার কথা। আমি আনন্দের সঙ্গে বললাম তিনি সব দিবেন। মোতলগজী বললেন , 'খুব খুশি তাই না— এক পয়সা নেবে না, যা দেওয়ার আমি পাঠাব।' সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেলাম। কারণ ওই বিজেপি-র টাকা পেয়ে আমার মধ্যে নানারকম অবগুণ আসতে পারে, সেটা হতে দেওয়া যাবে না— তাই তাঁর এই কথা, এই ধারণাই আমার হলো।

মালদার একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে আমাদের তৎকালীন কার্যকর্তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। তিনি এলেন, দু'মিনিটেই তাঁর কথায় সব ঠিক হয়ে গেল। এই ছিল তাঁর ক্ষমতা। একবার মালদায় সঙ্ঘশিক্ষাবর্গ (২য় বর্ষ) হবে। আমরা জায়গা দেখে বেড়াচ্ছি। সঙ্গে মোতলগজী। কোথায় প্যান্ডেল হবে, কোথায় রান্নাঘর, বসতি সব বিষয়ে কথা হচ্ছে। প্রতি কথাতেই তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন লক্ষ্য করেছিলাম।

তাঁকে কোনও সময়েই দীর্ঘ বক্তব্য রাখতে দেখিনি। তিনি বলতেন, সঙ্ঘ জেনারেটার। বিদ্যুৎ তৈরি করবে। সেই বিদ্যুতে বাল্ব, পাখা যেমন চলে, সেরকম সঙ্ঘ সমস্ত ক্ষেত্রকে আলোকিত ও চলমান করবে। মনে রাখার মতো উপমা বলেই বার বার মনে পড়ে। বহুবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। প্রত্যেক বারেই কিছু শিখেছি, তাতে অভিজ্ঞতা বেড়েছে। তিনি শেষ সময়ে নাগপুর সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয়ে থাকতেন। সেখানে কর্মসূত্রে মালদার স্বয়ংসেবক সঞ্জয় সাহাকে যাতায়াত করতে হয়। একবার সে ফিরে এসে বলল, একজন বয়স্কলোকের সঙ্গে দেখা হলো, আপনার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। ফোন নম্বর দিয়েছেন, ফোন করতে বলেছেন।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলাম। মোতলগজী বললেন, কী আমার কথা মনে আছে? আমি লজ্জায় বললাম, ছি ছি কী বলছেন! আপনার সান্নিধ্যের প্রতিটি মুহূর্ত মনে আছে। বেশি কথা বলতে পারলেন না। ফোন কেটে দিলাম। এই অল্প সান্নিধ্যেই যদি আমার এই অভিজ্ঞতা হয় তবে তাঁর সঙ্গে যারা থেকেছেন, বেশি সময় কাটিয়েছেন, তাদের অভিজ্ঞতার ঝুলি কত না বড়ো।

তিনি চলে গেছেন, কিন্তু দাগ কেটে গেছেন আমার মতো হাজারো স্বয়ংসেবকের মনে।

(লেখক পূর্বতন প্রান্ত সঙ্ঘচালক, উত্তরবঙ্গ)

সন্ততুল্য মোতলগজী

গৌরাঙ্গ দাস

মোতলগজী তখন ক্ষেত্র প্রচারক। তিনি নদীয়া জেলা প্রবাসে আসছেন। আমি কৃষ্ণনগর নগর প্রচারক। মোতলগজী শিয়ালদা থেকে কৃষ্ণনগর লোকাল ট্রেন ধরে কৃষ্ণনগর সিটি জংশনে নামবেন। ট্রেন আসার কিছু আগে আমি স্টেশনে অনুসন্ধান অফিসে অনুরোধ করলাম, আমাদের একজন অধিকারী এই ট্রেনে নামবেন, নামটা ঘোষণা করে দিলে ভালো হয়। অনুসন্ধান বিভাগের ভদ্রলোক বললেন, তাঁর নাম কী? আমি তাঁর নাম বললাম। তিনি বললেন, তিনি কি কোনো সাধুসন্ত? আমি বললাম, সাধুসন্ত নন, কিন্তু সাধুসন্ত তুল্য। উনি সুদূর মহারাষ্ট্র থেকে এসেছেন, আমরা তাঁকে সঙ্ঘের প্রচারক বলি।

সত্যিই মোতলগজী সন্ত তুল্যই ছিলেন। আমি কখনো তাঁকে রাগ করতে দেখিনি, হতাশ হতে দেখিনি, সব সময় সবাইকে উৎসাহ দিতে দেখেছি। কোনো পরিবারে গেলে মনে হতো তিনি সেই পরিবারের একজন সদস্য। আমাদের এত সরল ভাবে জিজ্ঞেস করতেন, 'তুমি আজকাল কোথায় আছো ভাই? তোমার কী দায়িত্ব?' শুনে মনটা ভরে যেত।

তিনি এত সহজভাবে বৈঠক নিতে তা সকলের বোধগম্য হতো। সহজ সরল উপমা দিতেন আর বলতেন— উপমা কখনোই একশো শতাংশ ঠিক হয় না। বলতেন, সন্ত কুকুরের মতো ঘুমায়, তাই বলে সন্ত কুকুর নয়, তার ঘুমানোটা কুকুরে মতো। আরও বলতেন, প্রচারক হচ্ছে মুড়ির মতো, কেননা মুড়ি জল দিয়ে খাওয়া যায়, চিনি দিয়ে খাওয়া যায়, তরকারি দিয়ে খাওয়া যায় অর্থাৎ মুড়ি অ্যাডজাস্ট করে চলতে পারে। সেরকমই প্রচারকের কাজ— সবার সঙ্গে চলা, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলা— এরকম সংগঠক। তিনি কার্যকর্তা এবং তাঁদের পরিবারের কুশল মঙ্গল জিজ্ঞাসা করতেন। তাঁর হৃদয় ছিল আত্মীয়তার ভাণ্ডার, অকৃত্রিম ভালোবাসা যাকে বলা হয়।

তাঁর দুটি বাক্য আমাকে বেশি প্রেরণা দিয়ে থাকে, (১) সঙ্ঘ কার্যপদ্ধতি অতুলনীয় কার্যপদ্ধতি, (২) স্বয়ংসেবকদের জীবন হবে— সাধারণ জীবনযাপন, উচ্চ চিন্তন। তাঁর সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর সহজতা। কখনো কারো সঙ্গে তর্কবিতর্কে জড়িয়ে পড়তেন না। সকলের হৃদয় জয় করেছেন। সর্বত্র গুণ দর্শন করেছেন। গীতার ভাষায় বলতে গেলে তিনি একজন লোকসংগ্রহী যোগ্য সংগঠক। তিনি ছিলেন ধীরস্থির, অবিচলিত। কেশব ভবন থেকে নাগপুরে চলে যাওয়ার দিন বালকসুলভ সরলতায় সবার কাছে অনুমতি নিচ্ছেন। সে দৃশ্য আজও মনকে স্পর্শ করে। তাঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ হয় ২০১৯ সালে তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ থেকে ফেরার দিন নাগপুর প্রধান কার্যালয়ে। তখন শারীরিক ভাবে অসুস্থ থাকলেও স্মৃতিশক্তি ঠিক ছিল। আমাদের প্রদেশের কার্যকর্তাদের এবং কয়েকজনের পরিবারের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। এরকম এক মহাজীবন আমাদের দীর্ঘদিন কাজের প্রেরণা দিতে থাকবে।

(লেখক দিনাজপুর বিভাগ প্রচারক)

শ্রীকৃষ্ণদার প্রয়াণে স্বজন বিয়োগের ব্যথা

গোবিন্দ ঘোষ

যে দুটি সাংগঠনিক ধারাপ্রবাহ বর্তমানে ভারতবর্ষ তথা বিশ্বকে পরিশীলিত ও পরিশুদ্ধ করছে, তার একটি হলো— শ্রীরামকৃষ্ণ- বিবেকানন্দ প্রবর্তিত ধর্মীয় আধ্যাত্মিক ধারা।,যার উৎস ভূমি কলকাতা তথা বঙ্গভূমি। দ্বিতীয়টি হলো— ডাক্তারজী-গুরুজী প্রবর্তিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক ধারা, যার উৎসভূমি নাগপুর তথা মহারাষ্ট্র।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকেই এই দুই প্রদেশের আদান-প্রদান সুবিদিত। সঙ্ঘকার্য বিস্তারের প্রাথমিক ধাপে নাগপুর থেকে বাঙ্গলায় এসেছেন শ্রীগুরুজী, বালাসাহেব দেওরসজী। পরবর্তীতে একের পর এক প্রচারক নাগপুর ও মহারাষ্ট্র থেকে বাঙ্গলায় এসেছেন। শ্রীকৃষ্ণ মোতলগজী নাগপুরে বালুজী নামে পরিচিত। আমাদের এখানে এসে হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণদা। তিনি পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন সহ-প্রান্ত প্রচারক রূপে ১৯৮১ সালে। কলকাতাকে কেন্দ্র করে কাজ শুরু করেছেন। ক্রমশ সমগ্র রাজ্যের সব জেলায় গেছেন। পরবর্তীতে প্রান্ত প্রচারক, পূর্ব ক্ষেত্র (পশ্চিমবঙ্গ ও অসম) প্রচারক, অখিল ভারতীয় সহ-প্রচারক প্রমুখ হয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণদার চরিত্রের অনেক দিকের মধ্যে একটি দিক হলো, যে কার্যকর্তার পরিবারে তিনি গেছেন সেই পরিবারের সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। অনেক পরিবারে তিনি ভাই বা দাদার মতো পরিবারের একজন সদস্য, কোথাও অভিভাবকের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রয়াণে সেইসব পরিবার আজ আত্মীয় বিয়োগ অনুভব করছেন। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে বিশেষ তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তারজীর বাড়ি ও প্রধান কার্যালয় দর্শনের সময় শ্রীকৃষ্ণদার সঙ্গে অন্তিম সাক্ষাৎ হয়। বয়স ও ঠাণ্ডায় একটু ভারাক্রান্ত থাকলেও তাঁর ঘরে পশ্চিমবঙ্গের সব শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরিচয় করেন। পরিচিত সবার খোঁজখবর নেন। এটা সেবারের পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার্থীদের কাছে এক দুর্লভ মুহূর্ত ছিল।

সেই শ্রীকৃষ্ণদা আজ আমাদের মধ্যে নেই, তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

(লেখক উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সম্পর্ক প্রমুখ)

শ্রীকৃষ্ণজী লহ প্রণাম

রাহুল সিন্‌হা

সঙ্ঘের প্রচারক বিদ্যুৎ দত্তের নির্দেশে সঙ্ঘের শাখা জীবন থেকে ১৯৮০ সালে বিজেপির জন্মলগ্নেই রাজনীতিতে প্রবেশ করি। কিন্তু আজও শাখার মাঠ (সঙ্ঘস্থান) নিত্য প্রতিদিনের কর্মকাণ্ডের একটি প্রধান কর্ম ও প্রেরণা হিসেবে আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সেই সঙ্ঘস্থানেই সম্ভবত ১৯৭৮ সালে কেশবরাও দীক্ষিত ও শ্রীকৃষ্ণ মোতলগজী আসেন। তখন আমি শ্যামাপ্রসাদ নগরের রায়গড় শাখার স্বয়ংসেবক, বর্তমানে বিজয়গড় শাখার। সেই জীবনে আমার প্রথম দুই মহামানবের যুগল দর্শন করার সৌভাগ্য হয়।

এরপর ১৯৮২ সালে দলের রাজ্যস্তরে কাজের সুবাদে সঙ্ঘের বৈঠকে অংশ নিতে পারার কারণে মোতলগজী ও কেশবজীর সঙ্গে বারবার দেখা হওয়ার সুযোগ হতো। তখন রীতি ছিল সঙ্ঘের এই ধরনের বৈঠকে বিবিধ ক্ষেত্রে কার্যকর্তারা অবশ্যই হাজির থাকবেন। সেই থেকেই ধীরে ধীরে এদের কাছে আসার ও ঘনিষ্ঠ হওয়ার পরম সৌভাগ্য লাভ করেছি। কোনো সমস্যা হলেই ২৬ নং অর্থাৎ আগের সঙ্ঘ কার্যালয়, পরে কেশব ভবনে গিয়ে তাঁদের পথনির্দেশ নিয়েছি।

শ্রীকৃষ্ণজী নিজেকে এতো গুটিয়ে রাখতেন, যার ফলে তিনি সহ প্রান্ত প্রচারক, প্রান্ত প্রচারক, পরে ক্ষেত্র প্রচারক, তারও পরে অখিল ভারতীয় প্রচারক প্রমুখ ছিলেন। কিন্তু তাঁর ব্যবহার বা কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে তা বোঝার কোনো উপায় ছিল না। সব সময় মনে হতো একজন নিষ্ঠাবান, পবিত্র, অহংকার জয়ী সাধারণ স্বয়ংসেবক তিনি। বহুবার তাঁর সঙ্গে একান্তে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। কোনো অপরাধ বা ভুল করলেও বকুনি দিতেন না, কিন্তু সাধারণ কণ্ঠস্বরে জানতে চাইতেন বিষয় সম্পর্কে। সব শোনার পর অকপটে বলতেন, এবার এই নিয়ে আমায় কেউ কিছু বলতে এলে আমিও কথা শুনিয়ে দেবো। কী সরল ভাষ্য। এককে সময় মনে হতো নিজের জীবনের সব দুঃখ কষ্ট শ্রীকৃষ্ণজীকে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়ে যাই। মনে হবে না কেন, তাঁর নাম যে শ্রীকৃষ্ণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সত্যনিষ্ঠা, অসহায়ের প্রতি সহানুভূতি, নিঃস্কাম কর্মই শ্রীকৃষ্ণজীকে দেবতুল্য করে তুলেছে। নাগপুরে জন্ম, সেখানে বড়ো হওয়া, অথচ পশ্চিমবঙ্গে এসে পুরোপুরি এখানকার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া — এটা তাঁর জীবনের একটি মহান বৈশিষ্ট্য। এতো সরলতা, সাধারণ জীবন, মিষ্ট ব্যবহার হওয়া সত্ত্বেও যে বিষয়টি ঠিক নয় সেই বিষয়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় কণ্ঠে বলতে কখনো পিছপা হননি। আমি তাঁর জীবনের অনেক ঘটনার উল্লেখ করতে পারি কিন্তু সেসব বলতে গেলে অন্য কেউ ব্যথা পাবে বা আমায় ভুল বুঝতে পারে তাই সেই সকল উল্লেখ করলাম না। তখন সুনীলপদ গোস্বামী ক্ষেত্রীয় প্রচারক, প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। সেখান থেকে শ্রীকৃষ্ণজীর ঘর, একবার ঢুকলে দেড়-দু' ঘণ্টার আগে শ্রীকৃষ্ণজীর ঘর থেকে বের হওয়া যেত না। দুপুরে বিশ্রাম করার সময়ও বলতেন, 'তুমি এলে ডেকে দেবে।' একদিন সুনীলদার ঘর থেকে বেরিয়ে শ্রীকৃষ্ণজীর ঘরের দিকে রওনা যাচ্ছি, একজন কেউ আমায় বললেন, 'তিনি এখন ঘুমিয়ে আছেন, এখন যেও না।' আমি বললাম, 'তিনি আমায় বলে রেখেছেন, তুমি যখনই আসবে আমি ঘুমিয়ে থাকলেও ডেকে দেবে, কোনো সংকোচ করবে না।' তিনি সম্ভবত অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'বারবার তোমার এতো কী কাজ? এতোবার আসার কী দরকার?' অবশেষে ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকে ঘুম ভাঙিয়ে শ্রীকৃষ্ণজীকে বললাম, আমি এলে কী আপনি অখুশী হন?' স্বাভাবিক উত্তর, কেন! আমি সব খুলে বললাম। আমার সব অনুরোধ উপেক্ষা করে যিনি আমাকে নিষেধ করেছিলেন তাকে আমার সামনেই ডেকে যা বলা প্রয়োজন তা সহজভাবে বলে দিলেন। জীবনে বহু প্রচারকের আশীর্বাদ পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণজী অবশ্যই অন্যতম।

সেই দিনটির কথা আজও আমার মনে পড়ে, যেদিন পাকাপাকি ভাবে কলকাতা ছেড়ে তিনি নাগপুর ফিরে যাচ্ছেন। কেশব ভবনে বিদায় সমারোহের ব্যবস্থা হয়েছে। সকলেরই ভারাক্রান্ত হৃদয়ের সুস্পষ্ট লক্ষণ মুখমণ্ডলে ফুটে উঠেছে। এতোদিনের কর্মস্থান, এতো মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার মায়া কাটিয়ে জন্মস্থানে ফিরে যাওয়ার এক বিন্দু আনন্দের রেখা তাঁর চোখ-মুখে দেখতে পাইনি। তিনি নাগপুরে জন্মালেও তিনি আমাদের, তিনি পশ্চিমবঙ্গের। পরের দিন দেখা করে বললাম, 'তাহলে চলেই যাচ্ছেন! নাগপুর গিয়ে আমাদের ভুলে যাবেন।' তিনি বললেন, 'দেখ রাহুল, আমার সারা দেহের রক্তে নাগপুর আছে কিন্তু হৃদয়ে শুধু বাঙ্গলা।' তিনি আবার বাঙ্গলায় কয়েক দিনের জন্য আসবেন বলেছিলেন, শুনেছি এসেও ছিলেন, কিন্তু খবর না পাওয়ার কারণে দেখা করতে পারিনি।

তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, নাগপুরে গিয়ে কী বাড়ি ফিরে যাবেন? তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে জবাব — 'ভাই-বোনেরা চাইছে বাকি জীবনটা পরিবারে কাটাই। তাই বাড়িতে কয়েকটা দিন কাটিয়ে নাগপুর নিবাসে ফিরে যাব। সেখানেই থাকব।' নাগপুরে থাকতে থাকতে অন্তত সাতবার আমার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। তাঁর ছোটোবেলার বন্ধু, স্কুলের সহপাঠী, প্রচারক দেবদাস আপ্তেজীর ফোনে শেষবার লকডাউনের ১০ দিন আগে কথা হয়। আমি শ্রীকৃষ্ণজীকে বললাম, আমি নাগপুরে কখনও যাইনি। এবার লকডাউন উঠে গেলে নাগপুর গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করে আসবো। কিন্তু তখন ভাবিনি শ্রীকৃষ্ণজী ইহলোকের মায়া এতো তাড়াতাড়ি শেষ করে পরলোকে যাত্রা করবেন। আজ তিনি নেই একথা সত্য কিন্তু তাঁর কর্মের মধ্যেই তিনি আমাদের মধ্যে বেঁচে আছেন। বেঁচে থাকবেন। আমাদের জন্য রেখে গেলেন তাঁর কৃতি ও আশীর্বাদ। তাই তাঁর প্রতি রইল অগাধ শ্রদ্ধা, 'হে শ্রীকষ্ণ লহ প্রণাম।'

(লেখক ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যকর্তা)

শ্রীকৃষ্ণদার সান্নিধ্যে

ডাঃ শম্ভুনাথ ধাড়া

স্মৃতি খুবই মধুর হয় যদি তা নিঃস্বার্থ সাধকজনের সান্নিধ্য পাওয়া হয়। সমাজ সংগঠনে নিজেকে 'রাষ্ট্রায় স্বাহা' করেছেন সেই শ্রীকৃষ্ণ মোতলগজী আজ আমাদের মধ্যে নেই। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে প্রচারক রূপে সেই সুদূর নাগপুর থেকে এসেছিলেন অসমে, তারপর ১৯৮১ সালে পশ্চিমবঙ্গে সহ-প্রান্ত প্রচারকের দায়িত্ব নিয়ে । আমি ওই বছর অসুস্থ হয়ে বহরমপুর থেকে প্রান্ত কার্যালয় ২৬ নম্বর বিধান সরণিতে এসেছিলাম। তার বেশ কয়েকদিন পরে তিনি নাগপুর থেকে এলেন। তারপর প্রায় ২৮ বছর তাঁর সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। প্রচারক জীবনে কত কঠিন পরিস্থিতিতে কাটাতে হয়েছিল তা মর্মে মর্মে জানি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণদা ছিলেন— সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে তথা মানাপমানয়োঃ। তবেই তো প্রান্ত, ক্ষেত্রীয়, অখিল ভারতীয় কার্যকর্তা হয়েছেন।

একবার আমি শ্রীকৃষ্ণদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ডাক্তারজী যে প্রথম শাখা শুরু করেছিলেন তখনকার কোনো স্বয়ংসেবক কিংবা কার্যকর্তা বেঁচে আছেন কিনা। শ্রীকৃষ্ণদা বলেছিলেন— 'নাগপুরে তুমি এখন অন্তত ১০০ জনকে পাবে, যাঁরা বলবেন 'আমি ওই পাঁচজনের একজন'। এটা শুনে আমার হাসি পেল। তিনি বললেন, এখন সব প্রান্তে সঙ্ঘের শাখা— তাই তাঁরা একথা বলে আনন্দ পান।

আমি কোনোদিন শ্রীকৃষ্ণদাকে অস্থির ভাবে দেখিনি । একজন সাধক যেরকম ধীর, স্থির ভাবে সব সমস্যার সমাধান করেন, তাঁকেও সেরকম দেখেছি। সঙ্ঘের বৈঠকে সব শুনতেন, তারপর সমাধান করতেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মারা যাওয়ার খবর কেশব ভবনে আমরা পাই রাত প্রায় ১টার সময়। ইন্দিরা গান্ধী মারা যাওয়ার অভিজ্ঞতা থাকায় কেশবজী ও আমি কেশব ভবন সুরক্ষার কথা ভাবি। বলা যায় না কংগ্রেসি গুন্ডারা যদি ভবন আক্রমণ করে। তাই সমস্ত স্কুটার হলঘরে রাখছি, এমন সময় খবর পাই মানিকতলা থেকে কংগ্রেসের মিছিল এদিকেই আসছে। কেশবজী বললেন মোতলগজীকে খবরটা দাও। তখন রাত্রি প্রায় দুটো হবে। আমি পাঁচতলায় শ্রীকৃষ্ণজীকে কথাটা বললাম। শ্রীকৃষ্ণদা বললেন— কোথায় হয়েছে, আমি বললাম মাদ্রাজের পেরামপুদুরে। শুনে বললেন, 'আচ্ছা'। কোনো অস্থিরতা নেই । কত বড়ো সাধক হলে তবেই নির্বিকার থাকতে পারেন।

কেশব ভবন তৈরিতে তাঁর পরিকল্পনা অপরিসীম। কলকাতার স্বয়ংসেবকদের কার্যালয় নির্মাণের অর্থ সংগ্রহেরহ প্রেরণা জুগিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণদা। তিনি নিজে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন সেজন্য অনেক সুবিধা হয়েছে। কেশব ভবনের প্ল্যান বাসুবাবু করলেও শ্রীকৃষ্ণদাই আসল ছিলেন।

তিনি আমাদের বলতেন যে, তাঁর বড়দার প্রচারক হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু দাদাকে ঘরে রেখে শ্রীকৃষ্ণদা নিজেই প্রচারক বেরিয়ে গেলেন। খুব মিতব্যয়ী ছিলেন তিনি। ২৬নং কার্যালয়ের ছোটো টালির ঘরে দুদিকে দুটি খাট, একদিকে কেশবজী আর একদিকে শ্রীকৃষ্ণদা ছোটো খাটে থাকতেন। ছোটো টেবিলে ল্যান্ড ফোন থাকত। জামা-কাপড় বলতে দু'জোড়া। তাও পূজার সময় অমলদা কিনে দিতেন। নিজে হাতে জামা-কাপড় কাচতেন। কোনোদিন কাউকে দিয়ে নিজের ব্যক্তিগত কাজ করাতেন না। ২৬ নম্বরে আমরা ১২/১৩ জন থাকতাম। প্রতিদিন টেবিলে এসে একসঙ্গে জলপান করতেন, গল্প করতেন।

একবার কালকাতার বাইরে থেকে আসা কোনো স্বয়ংসেবকের উপর কেউ খারাপ ব্যবহার করেছিল ২৬ নম্বরে। শ্রীকৃষ্ণদা শুনে খুব দুঃখ পেলেন ও বললেন--- আমরা স্বয়ংসেবকদের বাড়ি বাড়ি যাই, বিশেষ করে প্রবাসে, আমাদের তারা কত খাতির করে, আদর করে, থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে। আর সেই স্বয়ংসেবক এখানে এলে দুর্ব্যবহার কেন পাবে? তিনি বললেন, সর্বত্র একই মধুর ব্যবহার হওয়া উচিত। এটা প্রান্ত কার্যালয়, পুরো প্রদেশের স্বয়ংসেবকেরা এখানে আসবে। কার্যালয় আদর্শের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত।

কয়েক মাস আগে ফোনে নাগপুর থেকে কথা বলছিলেন, আমার বাড়ির খবর নিয়েছিলেন— কে কী রকম আছে। আমাদের বাড়ি অনেকবার এসেছেন। শেষবার ২০১৫ সালে কেশবজী ও শ্রীকৃষ্ণদা এসেছিলেন। আমার মেয়ে ও জামাইয়ের সঙ্গে কথা বললেন।জামাই সৌকত মাজীকে জিজ্ঞাসা করেন— কী করো, কী পাশ। উত্তরে এএমআই পাশ করে বিএসএনএলে চাকুরি করার কথা বলে জামাই। শ্রীকৃষ্ণদা বললেন, খুব কঠিন এএমআই পাশ করা। আমি বি.টেক করেছি সহজ ভাবে। সেই সৌকত মাজী এখন শাখা কার্যবাহ। আমাকে বললেন— তুমি নার্সিং ধরছ ছাড়ছ কী ব্যাপার। আমার এমডি(এএম) সার্টিফিকেটটা দেখতে চাইলেন, বললেন— এতদিন তুমি তো বলোনি। আমি বললাম নিজের কথা আর কী বলব। সেদিন দুজনে দুপুরে খেয়েদেয়ে বিকালে কেশব ভবনে ফিরলেন। তারপর কয়েকবার কেশব ভবনে দেখা হয়েছে। বছর চারেক থেকে তিনি নাগপুর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে থাকতেন। দ্রুত তাঁর শরীর খারাপ হতে থাকে। গত ২ আগস্ট তিনি আমাদের ছেড়ে অমৃতলোকে চলে গেলেন।

একজন মহান প্রচারককে আমরা হারালাম। তাঁর ত্যাগ, সাধনা, সবকিছু শুধু রাষ্ট্রের জন্য সঁপে গেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত সবকিছুই তিনি রাষ্ট্রের কল্যাণে সমর্পণ করেছেন। তার আদর্শ, ভালোবাসা বেঁচে থাক আমাদের মধ্যে। শ্রীকৃষ্ণদা আবার আসবেন ফিরে আমাদের মধ্যে।

(লেখক হাওড়া মহানগরের স্বয়ংসেবক)

প্রেরণাস্রোত শ্রীকৃষ্ণ মোতলগজী

রাজু কর্মকার

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তারজীকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু যে কজন সঙ্ঘ প্রচারক, কার্যকর্তার মধ্যে প্রবলভাবে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজীর ছায়া প্রত্যক্ষ করেছি তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ মোতলগজীর নাম সবার প্রথমে উজ্জ্বল ভাবে অবস্থান করবে। তাঁর শীতল স্নেহের পরশ আজও হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রীতে জাগ্রত হয়ে আছে। হাজার হাজার স্বয়ংসেবককে তাঁর স্নেহ ও ভালোবাসার পরশ গঙ্গার পবিত্রতা দান করেছে। তাঁর পথনির্দেশ প্রতিক্ষণ আমাদের পাথেয়।

শ্রীকৃষ্ণ মোতলগজী বলতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে ধীর স্থির দুটি চোখ, শান্ত ও ভাবগম্ভীর একটি উজ্জ্বল মুখমণ্ডল, জাদুকাঠি ছোয়ানো অপূর্ব স্নেহময় দুটি হাত। বাঙ্গলার মাটি-জল-বাতাস ভেজানো এক অপূর্ব কণ্ঠস্বর। তাঁর জীবনের প্রতিটি আচরণে প্রকাশ পেত দেশ- সমাজ-জাতি ও হিন্দু সমাজ সংস্কৃতির শান্ত শুভ্র রূপ। দর্শনমাত্রই আমাদের মনের মধ্যে এক প্রশান্তি এনে দিত। প্রান্ত প্রচারক হিসেবে ও ক্ষেত্র প্রচারকর হিসেবে তাঁর যে যোগ্যতা, দক্ষতা এবং কঠোর পরিশ্রম আমি প্রত্যক্ষ করেছি তা এক কথায় অনুপম।

আমরা প্রায়শই বলে থাকি এক দেশ ও এক সংস্কৃতির কথা, আমরা প্রায়শই বলে থাকি ভারতের মাটি আমার মাটি, ভারতের ভাষা আমার ভাষা, ভারতের মানুষ আমার আত্মীয়। কিন্তু আমাদের যদি বলা হয় তোমাকে মহারাষ্ট্র যেতে হবে, তোমাকে মারাঠি ভাষা শিখতে হবে, তোমাকে মারাঠি খাবার খেতে হবে, মারাঠি সংস্কার ও রীতিনীতি রপ্ত করে সফলভাবে মহারাষ্ট্রে একটি জীবন্ত সংগঠন দাঁড় করাতে হবে — তখন কজন বাঙ্গালি যুবক আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সম্মতিসূচক হাত মহাআনন্দে উপরে তুলবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

বিপরীত ভাবে যখন এক মারাঠি যুবককে বঙ্গপ্রদেশ সম্পর্কে এরূপ বলা হয় তখন তিনি সানন্দে হাসিমুখে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে শুধু রাজিই হয়ে যাননি, সফল ভাবে সংগঠন ও ব্যক্তি সংস্কার করে দেখিয়েছেন। আত্মবলে বলীয়ান, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, অকুতোভয় এই যুবকটি আমাদের প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ মোতলগজী। ১৯৮১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৪ বছর বাঙ্গালি হয়ে পশ্চিমবঙ্গে অবস্থান করেছেন, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্ঘকাজকে গতি দান করেছেন।

১৯৮১ সালে সহ-প্রান্ত প্রচারক হিসেবে তিনি এখানে আসেন এবং নিজের যোগ্যতা, শক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের স্বয়ংসেবকদের আপনজনে পরিণত হন খুব দ্রুত। পরবর্তীকালে প্রান্ত প্রচারক হিসেবে বাঙ্গলার সংগঠনকে দিশানির্দেশ করেছেন বেশ কয়েক দশক ধরে। শ্রীকৃষ্ণদা পরবর্তীকালে পূর্বক্ষেত্র প্রচারক হিসেবে সফলতার সঙ্গে কাজ করেছেন। মূলত রাষ্ট্রবিরোধী, দেশবিরোধী, হিন্দুত্ববিরোধী কমিউনিস্টদের সঙ্গে বৈচারিক লড়াই করে সুদূর মহারাষ্ট্র থেকে আগত আত্মপ্রত্যয়ী এই প্রচারক যেভাবে বাঙ্গলার হাজার হাজার স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তাকে উৎসাহিত করেছেন এবং সঙ্ঘকাজে আত্মনিয়োগ করবার প্রেরণা দিয়েছেন তা বিশেষ ভাবে বলা প্রয়োজন। কলকাতা থেকে কোচবিহার দুরন্তগতিতে ছুটে বেড়িয়েছেন, প্রতি জেলা, প্রতি নগর, প্রতি খণ্ডে তাঁর প্রাণবন্ত উপস্থিতি বাঙ্গলা চিরকাল গৌরবের সঙ্গে স্মরণ করবে। ১৯৮৪ সালে একাত্মতা রথযাত্রার সময়ে তাঁর পরামর্শ ও পরিকল্পনা আমরা সকলে প্রত্যক্ষ করেছি।

ব্যক্তিগত ভাবে ১৯৮৮ সালে প্রথম বর্ষ সঙ্ঘশিক্ষা বর্গে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তখন আমি সবেমাত্র বালক থেকে তরুণ হচ্ছি। অধিকারী কক্ষে পরিচয় পর্বটি ছিল খুব ছোটো এবং অতি সাধারণ। তার বেশ কয়েকবছর পর মালদা কার্যালয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হয় এবং আমার নাম ধরে আমাকে ডাকেন। জীবনের যেকটি আনন্দের ক্ষণ আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে সেগুলির মধ্যে স্বগৌরবে জায়গা করে নিয়েছে শ্রীকৃষ্ণ মোতলগজীর মারাঠি স্বরে বাংলা উচ্চারণ— 'রাজু ভালো আছো? পড়াশুনা কেমন চলছে?' একজন প্রান্ত প্রচারক আন্তরিকতার সঙ্গে স্বয়ংসেবকের ঘাড়ে হাত দিয়ে স্নেহ বিতরণ করে তখন সদ্য যৌবনে পা রাখা এক তরুণের হৃদয়ে কেমন প্রতিক্রিয়া হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ক্ষেত্র প্রচারক থাকাকালীনও একাধিকবার আমাদের বাড়িতে এসেছেন। খুব ছোটো ছোটো বিষয় নিয়ে জমিয়ে আড্ডা হয়েছে, জমিয়ে খাওয়া-দাওয়া হয়েছে। ধীশক্তি প্রবল থাকলে অন্য প্রদেশের ভাষা রপ্ত করা যায় কিন্তু খাদ্যাভাস! বেশ কষ্টকর বিষয়। কয়েকবছর পূর্বে এক দক্ষিণ ভারতীয় সন্ন্যাসী আমাদের ঘরে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে বাংলায় ব্যাকরণ, সংস্কৃতি, মুসলমান ও খ্রিস্টান আগ্রাসন, বঙ্গ রাজনীতিতে মুসলমান তোষণ ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিল। আলোচনার মধ্যে খাবারের কথা আসতেই সন্ন্যাসী আমাকে বললেন— 'আজ হামারা সবজি ঔর দালমেঁ থোড়া নারিয়ল ডালনা, নারিয়ল বিনা খানা দক্ষিণ ভারতীয়কোঁ না পসন্দ্।' বলাবাহুল্য রান্নার মধ্যলগ্নে হঠাৎ করে নারিকেল খুঁজতে

আমার কালঘাম ছুটে গিয়েছিল। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ মোতলগজীর কথা মনে পড়ছিল। ৯০-এর দশকের শেষের দিকে শ্রীকৃষ্ণজী একবার আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলছে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি আপনি কী খেতে পছন্দ করেন। তিনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন ১৫ মি. আমাকে একটু চিন্তাভাবনা করবার সময় দাও। আমাকে অন্য স্থানে পাঠিয়ে সেই সময়ের মধ্যে আমাদের বাড়ির খাবারের হাল- হকিকত সব জেনে ফেলেন। মা যেসব জিনিস রান্না করবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সেই খাদ্যদ্রব্যগুলির নাম আমি ফিরে এলে গড়গড় করে বললেন। ভ্রমণকালে পরিবারের উপর যাতে কোনো চাপ সৃষ্টি না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর থাকত। পরিবারের সঙ্গে কীভাবে একাত্ম হতে হয় শ্রীকৃষ্ণ মোতলগজী আমাদের হাতে-কলমে শিখিয়ে দিয়েছেন। আমার মতো ছোটো ছোটো হাজার কার্যকর্তার কাছে তাঁর জীবনের এক একটি আচরণ এক একটি ছোটো গল্প হয়ে আছে।

বাংলা ভাষাকে আত্মীকরণ করে তিনি বাংলায় যে ভাষণ রাখতেন তা যেমন ছিল তথ্য সমৃদ্ধ তেমনই ছিল হৃদয়স্পর্শী। তাঁর বৌদ্ধিক উপস্থাপনা কৌশল ছিল খুব আধুনিক। বিষয়ের সর্বদিকে আলোকপাত করা এবং ব্যক্তিগত অনুভব ব্যক্ত করে বিশেষ করে ডাক্তারজীর জীবনের ছোটো ছোটো উদাহরণ দিয়ে তিনি স্বয়ংসেবক ও সঙ্ঘানুরাগী ব্যক্তির মনে সোনার জাদুকাঠি স্পর্শ করতেন। তাঁর আচার-ব্যবহার, ভাব-ভাষা, সরল দেশপ্রেম বঙ্গপ্রদেশের সংগঠনে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিল। কত বৌদ্ধিক, প্রবচন ও ভাষণে এবং দৈনন্দিন আচরণে তিনি আমাদের প্রেরণাস্রোত হয়ে আছেন।

শ্রীকৃষ্ণ মোতলগজী প্রাকৃতিক নিয়মে ২ আগস্ট করোনা আবহের মধ্যেই অমৃতলোকে যাত্রা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সমাজে ও রাজনীতিতে যে জাতীয়তাবাদী ও হিন্দুত্ববাদী আবহাওয়ার জাগরণ হয়েছে তার পৃষ্ঠভূমি যাঁদের দীর্ঘ ত্যাগ ও তপস্যার ফলে রচিত হয়েছে—তাঁদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ মোতলগজী অন্যতম। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে আমরা যদি পশ্চিমবঙ্গকে পূর্বগরিমায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি, পরম বৈভবশালী রাষ্ট্র গঠনের কার্যে বঙ্গের মানুষ ও বঙ্গের কার্যকর্তাদের যোগ্য করে তুলতে পারি তবেই তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে, তাঁর ত্যাগ ও তপস্যা প্রকৃত মর্যাদা পাবে।

(লেখক হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সংযোজক)

কর্মযোগী প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ মোতলগজী

বিদ্যুৎ দত্ত

শ্রীকৃষ্ণ মোতলগের বাড়ি নাগপুর শহরে। তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে প্রচারক বের হন। শ্রীগুরুজী নাগপুরের স্বয়ংসেবকদের বাড়ি গিয়ে বলতেন— 'মা আপনার একটা ছেলেকে সঙ্ঘের কাজে দিতে হবে।' সেই আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণজীর বড়দার প্রচারক বেরোনোর কথা ছিল। কিন্তু তিনি না বেরোনোয় শ্রীকৃষ্ণজী প্রচারক বেরোন। তিনি প্রথম নাগপুর মহানগরের প্রচারক ছিলেন, তারপর অসমে সঙ্ঘের কাজে নিযুক্ত হন। এরপর ১৯৮১ সালে পশ্চিবঙ্গে সহ-প্রান্ত প্রচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

পরবর্তীকালে প্রান্ত প্রচারক, ক্ষেত্র প্রচারক হিসেবে কাজ করেছেন। অখিল ভারতীয় সহ-প্রচারক প্রমুখের দায়িত্বও পালন করেছেন। পরবর্তীকালে শারীরিক অসুস্থতার কারণে নাগপুরের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তাঁর কেন্দ্রস্থল হয়। মনে পড়ে শ্রীকৃষ্ণজী বৈঠকে ছোটো ছোটো বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ নজর দিতেন। তাঁর কাছে স্বয়ংসেবকরা যে কোনো প্রশ্ন করলে সরলভাবে তার উত্তর দিতেন। পশ্চিমবঙ্গে এসে এখানকার চালচলন, কথাবার্তা সবই বাঙ্গালিদের মতনই শিখে নিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণজী গ্রামে গ্রামে যখন ঘুরতেন তাঁর অসুবিধাই হতো, কিন্তু তিনি কাউকে বুঝতে দিতেন না। কল্যাণী শিবিরে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার সুবাদে আর্কিটেক্টের দায়িত্বটা তিনিই পালন করেন। তাঁর মতো কর্মযোগী প্রচারক থাকায় সঙ্ঘকাজ বিভিন্ন বাধার মধ্যেও এগিয়ে গিয়েছে। 'One life one mission'— এটাই শ্রীকৃষ্ণজী তাঁর জীবনে করে দেখিয়েছেন।

(লেখক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক)

শ্রীকৃষ্ণজী অধিকারী ছিলেন না

গৌতম কুমার সরকার

মোতলগজীকে আমি প্রথম দেখি ১৯৮৪ সালে। তখন আমি বুনিয়াদপুর খণ্ড কার্যবাহ। সায়ম্ সঙ্ঘস্থান। মাঠে ছিপছিপে জল ও কাদা। সেই মাঠেই তিনি পুরো সময় ছিলেন। কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। পরদিন ধুমপাড়া গ্রামের শাখায় যাবো। বললাম সাইকেল চালাতে পারেন কি না। উনি রাজি হলেন। রাস্তা ভালো ছিল না। শাখা ও বৈঠক সেরে কিছুটা চালিয়ে , বেশিটা হেঁটে পাকা রাস্তায় উঠলাম। বুঝলাম এটা করা উচিত হয়নি। তাঁর কিন্তু হাসি মুখ। তাঁর নাম বিভ্রাট ছিল। কেউ মোতলাগজী, কেউ মতলগজী, কেউ মতলবজী, কেউ মতলব বলতেন । সবেতেই তিনি খুশি ছিলেন। তাঁর মুখে কখনো হতাশাব্যঞ্জক কথা শুনিনি। আমাদের ঘাটতিকে উনি পূরণ করার চেষ্টা করতেন। কম কথা বলতেন, কিন্তু দু'চোখ সমানে কথা বলতো ও অনুধাবন করতো। আমি ৩৫ বছর ধরে প্রচারক, জীবনে অনেক দেবতুল্য অধিকারীর সান্নিধ্যে এসেছি, কিন্তু কখনো মোতলগজীকে অধিকারী মনে হয়নি। আপনজন ভেবে সব কথা বলতে পারতাম। তাঁর হৃদয় স্পর্শ করা বহু উদাহরণ আমি সবাইকে বলি। লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে উনি দু'চোখে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। তাঁকে আমার প্রণাম।

(লেখক বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দুই বঙ্গের কার্যকর্তা)

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ

সংকল্পনা সমূহের স্পষ্টীকরণ

ইন্দুমতী কাটদরে

জ্ঞানের অর্থ জানা। কিন্তু শুধু এটুকুতেই এর অর্থ বোঝানো যায় না। বাস্তবে জ্ঞানকে অধ্যাত্মের আলোকেই জানতে হয়। জ্ঞান হচ্ছে ব্রহ্মের স্বরূপ— 'সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম'। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত। এর অর্থ হচ্ছে জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান।

ব্রহ্ম কী? ব্রহ্ম হচ্ছে তত্ত্ব যা এই সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ তথা উপাদান কারণ। নিমিত্ত কারণ হচ্ছে সেই যা সৃষ্টির উৎপত্তিতে কর্তা অথবা স্রষ্টার ভূমিকা পালন করে। ব্রহ্ম সৃষ্টির সৃজনকর্তা। উপাদান কারণ হচ্ছে সেই যার দ্বারা সৃষ্টির সৃজন হয়ে থাকে। ব্রহ্ম থেকেই সৃষ্টির সৃজন হয়ে থাকে। অর্থাৎ সৃষ্টি হচ্ছে ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্মকেই আত্মা বা আত্মতত্ত্ব বলা হয়ে থাকে। এক অর্থে একে পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা বলা হয়ে থাকে। সৃষ্টি পরমাত্মার বিশ্বরূপ। তাই পরমাত্মার তথা সৃষ্টির স্বরূপ জানাই হচ্ছে জ্ঞান।

ব্রহ্মের স্বরূপ জানার অর্থ হলো নিজের স্বরূপকে জানা, কারণ আমরা ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নিজে থেকে যে সৃষ্টির সৃজন করেছেন সেই সৃষ্টির আমরাও অঙ্গ। একারণে আমাদের সত্য স্বরূপ ব্রহ্মাই। এই তথ্যের জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান এবং এটাই হচ্ছে জ্ঞানের পরমার্থ।

যেমন কিনা পরমাত্মার ব্যক্তরূপ সৃষ্টি, সেই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞানের ব্যক্তরূপ হচ্ছে সৃষ্টির জ্ঞান।

এই প্রকার জ্ঞানের দুটি দিক আছে—এক হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান ও অপরটি হলো সৃষ্টিজ্ঞান। এটি লৌকিক জ্ঞানও বটে। প্রচলিত অর্থে শিক্ষার ক্ষেত্র হচ্ছে লৌকিক জ্ঞান।

পরমাত্মা যখন সৃষ্টিরূপে ব্যক্ত হয়ে থাকে তখন বিবিধ রূপ ধারণ করে থাকে। ঠিক সেই প্রকার জ্ঞানও বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। কর্মেন্দ্রিয় থেকে যে জ্ঞান হয়ে থাকে তা হলো কুশলতা। এজন্যই জ্ঞানের একটা স্বরূপ হচ্ছে কুশলতা।

জ্ঞানেন্দ্রিয় থেকে যে জ্ঞান হয় তা হলো সংবেদন। এজন্যই জ্ঞানের একটা স্বরূপ হলো সংবেদন। সংবেদনকে অনুভবও বলা হয়ে থাকে।

মন ভাবনা করে থাকে। চিন্তন, মনন, কল্পনা ভাবনার ক্ষেত্র। এজন্যই মনের স্তরে জ্ঞান হল ভাবনা।

বুদ্ধি বিবেক তৈরি করে। বিবেকের অর্থ হচ্ছে যথার্থ জ্ঞান। যথার্থ জ্ঞানের অর্থ হচ্ছে যে যেমন আছে সেই স্বরূপের জ্ঞান। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ঠিক-বেঠিক অথবা উচিত-অনুচিতের জ্ঞানকে বিবেক বলা হয়ে থাকে। পদার্থের ক্ষেত্রে তার গুণাবলীর জ্ঞানকে বিবেক বলা হয়ে থাকে। একে বিজ্ঞানও বলা হয়ে থাকে। এটা হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান বা ভৌত বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের এই ক্ষেত্র অনেক বড়।

বিজ্ঞান মুখ্যত সমস্ত পদার্থের প্রক্রিয়াসমূহের জ্ঞান। লবণ জলে গুলে যায় কিন্তু বালি গুলে যায় না। এই গোলা না গোলার প্রক্রিয়ার জ্ঞানই বিজ্ঞান। জল ওপর থেকে নীচের দিকে প্রবাহিত হয়— এই গুণধর্মের নামই বিজ্ঞান। পঞ্চভূতাত্মক পদার্থ সমূহের আচরণ করার প্রক্রিয়ার জ্ঞান হচ্ছে ভৌতবিজ্ঞান। তেমনিভাবে মনের আচরণের বিষয়ে জানা হচ্ছে মনোবিজ্ঞান। আত্মার আচরণকে জানা হচ্ছে আত্মবিজ্ঞান।

বিজ্ঞান হচ্ছে বুদ্ধির ক্ষেত্র। অহংকারের স্তরে জ্ঞানের স্বরূপ হচ্ছে কর্তাভাব। তাই অহংভাবও জ্ঞানেরই স্বরূপ। মনের মধ্যে থাকা সংস্কারও জ্ঞানেরই এক স্বরূপ।

এসব কিছু জ্ঞানের বিভিন্ন স্বরূপ হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞান মূলরূপে হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান। এটা মন ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ইত্যাদি থেকে সৃষ্ট জ্ঞানের চেয়ে বড়। এটা হচ্ছে অনুভূতির ক্ষেত্র। অনুভূতির স্তরের জ্ঞান হচ্ছে শুদ্ধ জ্ঞান। আর সব হচ্ছে জ্ঞানের বিভিন্ন স্বরূপ। ভৌতিক জগতে বুদ্ধির স্তরের জ্ঞান হচ্ছে শ্রেষ্ঠ স্বরূপের জ্ঞান।

বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন স্বরূপের জ্ঞান লাভ করবার জন্য সেই কারণগুলোর অভ্যাস করতে হয় এবং অভ্যাস দ্বারাই নিজেকে সক্ষম করে তুলতে হয়। জ্ঞানের সঠিক স্বরূপ জানবার পর জ্ঞানার্জন কীভাবে করতে হয় এটা জানা যায়। লৌকিক জ্ঞান লাভ করবার সব যাত্রাপথ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবার দিকে উন্মুখ হলেই সঠিক হয়। ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত পৌছানোই সমস্ত লৌকিক জ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

২. ধর্ম

এই সৃষ্টিতে অসংখ্য পদার্থ রয়েছে। এসব পদার্থই গতিশীল। সকলের ভিন্ন ভিন্ন গতি ও অভিমুখ রয়েছে। পদার্থগুলির চরিত্রও ভিন্ন ভিন্ন। এদের ব্যবহারও ভিন্ন। তথাপি এরা একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না। পরস্পর বিরোধী স্বভাবের পদার্থ সমূহেরও সহবাস সম্ভব হয়ে থাকে। আমরা দেখতে পাই যে এদের অস্তিত্ব সৃষ্টিতে চলতেই থাকে। এর অর্থ হলো সৃষ্টিতে কোনো না কোনো মহতী শক্তি আছে যা সকল পদার্থকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণকারী এই শক্তি সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হয়েছে। এই ব্যবস্থা বা শক্তির নাম হলো ধর্ম। একে নিয়মও বলা হয়ে থাকে। এটা বিশ্বজনীন নিয়ম। এটাই ধর্মের মূলস্বরূপ। এই ব্যবস্থাই সৃষ্টিকে ধারণ করে থাকে। এজন্যই ধর্মের পরিভাষা হল 'ধারণাদ্‌ধর্মমিত্যাহুঃ'—ধারণ করে থাকে বলেই একে ধর্ম বলে। এই মূল ধর্মের ভিত্তির ওপর 'ধর্ম' শব্দের অনেক ব্যাখ্যা হয়ে থাকে। পদার্থসমূহের স্বভাব বা আচরণকে গুণধর্ম বলা হয়। আগুন উষ্ণ। তাই উষ্ণতা হচ্ছে

আগুনের গুণধর্ম। জলের গুণধর্ম হচ্ছে শীতলতা।

প্রাণীসমূহের স্বভাবকে ধর্ম বলা হয়। সিংহ ঘাস খায় না, এটা সিংহের ধর্ম। গোরু ঘাস খায় আবার মাংস খায় না, এটা গোরুর ধর্ম। এই ধর্ম বিশ্বনিয়মেরই একটি দিক। এই প্রকৃতিধর্মের অনুসরণ করেই মানুষও নিজের জীবনের জন্য ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে। এই ব্যবস্থাকেও ধর্ম বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ সমাজকে ধারণ করবার জন্য যেসব অর্থব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ইত্যাদি হয়ে থাকে তা হচ্ছে ব্যবস্থাধর্ম। এই ধর্মের পালন করাই হচ্ছে নীতি। এই নীতিকেও ধর্ম বলা হয়ে থাকে।

ব্যক্তির সমাজ জীবনে বিভিন্ন ভূমিকা হয়ে থাকে। কোনো ব্যক্তি যখন অধ্যয়ন কর্মে লিপ্ত থাকে তখন সে শিক্ষক। ঘরে থাকলে সে পিতা বা পুত্র হয়ে থাকে। বাজারে থাকলে সে গ্রাহক বা ব্যবসায়ী হয়ে থাকে। এই সব কর্তব্যসমূহকেও ধর্ম বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ—পুত্রধর্ম, পিতৃধর্ম, শিক্ষকধর্ম ইত্যাদি।

মানুষের পঞ্চভূতাত্মক জগতের প্রতি, প্রাণী সমূহের প্রতি, বনস্পতি জগতের প্রতি যে কর্তব্য আছে তাকেও ধর্ম বলা হয়ে থাকে।

মানুষের ইষ্টদেবতা, গ্রামদেবতা, কুলদেবতা, রাষ্ট্রদেবতা থাকেন। এসব ধর্মের অনেক প্রকারের আচার হয়ে থাকে। এইসব আচারকে ভিত্তি করে অনেক প্রকার সম্প্রদায় হয়ে থাকে। এই সম্প্রদায়গুলোকেও ধর্ম বলা হয়। সৃষ্টিকে ধারণের জন্য মানুষকে নিজের মধ্যে অনেক গুণ বিকশিত করবার প্রয়োজন হয়। একে সদ্‌গুণ বলে। এই সদ্‌গুণও হচ্ছে ধর্মের অঙ্গ। এইজন্য বলা হয়েছে---''ধৃতিক্ষমা দমোঽস্তেয়ম্ শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকম্ ধর্মলক্ষণম্।। (মনুস্মৃতি অধ্যায় ৬)

এসব আয়ামের মধ্যে ধর্ম ধারণ করার কাজ করে। এসব ধর্মের পালন দ্বারা ব্যক্তির তথা সমষ্টির অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স্ প্রাপ্ত হয়ে থাকে। অভ্যুদয়ের অর্থ হচ্ছে সর্বপ্রকারের ভৌতিক সমৃদ্ধি এবং নিঃশ্রেয়সের অর্থ হচ্ছে পারমার্থিক কল্যাণ।

৩. বৈশ্বিকতা

বৈশ্বিকতা হচ্ছে বর্তমান সময়ের একটি লোকপ্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি। সবার সবকিছু বিশ্বমানের চাই। বিশ্বজনীন মাপদণ্ডকে শ্রেষ্ঠ মাপদণ্ড বলে মান্য করা হয়। লোকে বলে থাকে যে, সঞ্চার মাধ্যমের প্রতাপে বিশ্বের যে কোনো কোণায় কখন কী হচ্ছে তা দেখতে পারি তা জানতে পারি ও তার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারি। দ্রুতগতিসম্পন্ন যানের কারণে আমরা বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যেতে পারি। যে কোনো জিনিস যে কোনো জায়গায় পাঠাতে চাইলে বা কোনো জিনিস আনাতে চাইলে তা সম্ভবপর হয়ে গেছে। বিশ্ব এখন টিভির পর্দায় আর টিভি এখন বৈঠকখানায় কিংবা শয়নকক্ষে ঢুকে পড়েছে। এটা কেবলমাত্র জানবার বিষয় নয়। একদেশ এখন অন্য দেশের এত কাছাকাছি এসে গেছে যে তারা একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারে না। বিশ্ব এখন একটা গ্রামের রূপ নিয়েছে। একারণে এখন বিশ্ব সংস্কৃতির কথাই বলা দরকার। এখন দেশ নয়, বিশ্ব নাগরিকতার কথাই বলা দরকার।

এখন দেশের কথা বলা সংকীর্ণতার পরিচয় দেয়। শিক্ষার প্রাক্-প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত বিশ্বমানের সংস্থান খুলে গেছে। বহুজাতিক সংস্থাসমূহ ব্যবস্থা করতে শুরু করেছে। ভৌতিক পদার্থ থেকে নিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য পর্যন্ত বিষয়গুলোর জন্য বিশ্বস্তরের মাপদণ্ড স্থাপিত হয়ে গেছে। মানুষ চাকুরি ও ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য এক দেশে থেকে অন্য দেশে সহজেই যাতায়াত করছে। এখন বিশ্বভাষা, বিশ্ব সংস্কৃতি, বিশ্ব নাগরিকতার কথা বলা হচ্ছে।

ভারতে বিশ্বায়নের আকর্ষণ একটু বেশি মাত্রাতেই দেখা যায়। ভাষা থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ জীবনশৈলীতে অভারতীয়তার ছাপ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। একারণে এ বিষয়ে একটু স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন।

এই বিশ্বায়নের মূল কোথায় তা জানা খুব দরকার। পাঁচশো বছর আগে ইয়োরোপীয় দেশগুলো বিশ্বযাত্রা শুরু করে। বিশ্বের পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোর সমৃদ্ধির প্রতি তাদের আকর্ষণ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপে তথাকথিত শিল্পবিপ্লব হয়েছিল। এতে বিভিন্ন যন্ত্রের আবিষ্কার হলো; বড়ো বড়ো কারখানায় বিপুল পরিমাণে উৎপাদন হতে শুরু করল। এসব উৎপাদনের জন্য ওই দেশগুলোর বাজারের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। তারও আগে য়ুরোপীয় আমেরিকায় নিজেদের উপনিবেশ স্থাপিত করল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকা স্বাধীন দেশে পরিণত হলো। এরপর আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলোতে বাজার স্থাপন করার কাজ আরও দ্রুতগতি লাভ করল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতে ব্রিটিশ রাজ স্থাপিত হতে শুরু করে। ব্রিটিশদের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল ভারতের সমৃদ্ধি লুণ্ঠন করা। একারণে ভারতে লুট ও অত্যাচার চলেছিল।

পশ্চিমের চিন্তাভাবনা অর্থনিষ্ঠ ছিল। আজও তাই আছে। একারণে পশ্চিমকে এখন সমগ্র বিশ্বে আর্থিক সাম্রাজ্য বিস্তার করতে হচ্ছে। আর এই উদ্দেশ্যেই বিশ্বায়নের পরিকল্পনা হয়ে চলেছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলো, আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার, বিশ্বব্যাঙ্ক ইত্যাদি হচ্ছে এই পরিকল্পনার উপকরণ। বিজ্ঞাপন, প্রতিশ্রুতি, বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠন ইত্যাদি হচ্ছে এর মাধ্যম।

ভারতে বিশ্বায়নের খুব আকর্ষণ আছে। কিন্তু আজ যে বিশ্বায়নের প্রচার চলছে তা হচ্ছে আর্থিক, অপর দিকে ভারতের বিশ্বায়ন হচ্ছে সাংস্কৃতিক। এই পার্থক্য আমাদের বোঝা দরকার। ভারতও প্রাচীনকাল থেকে অবিরাম বিশ্বভ্রমণ করেছে। ভারত নিজের সঙ্গে জ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা ও কলা নিয়ে গেছে। বিশ্বের দেশগুলোকে তারা কলা কৌশলের বিদ্যা শিখিয়েছে। বিশ্বের প্রত্যেক দেশে আজও ভারতীয় সংস্কৃতির চিহ্ন পাওয়া যায়। যেখানে যেখানে পশ্চিমের লোকেরা গিয়েছে সেখানে সেখানে নিজের সঙ্গে গোলামি, অত্যাচার, ধর্মান্তরণ ও' লুটের বিভীষিকা নিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু ভারত যেখানেই গিয়েছে সে নিজের সঙ্গে জ্ঞান সংস্কার ও বিদ্যা নিয়ে গিয়েছে। ভারতের বিশ্বায়নের সূত্র হলো—কৃন্বন্তো বিশ্বমার্যম্, অর্থাৎ বিশ্বকে আর্যে পরিণত করা। আর্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ করে তোলা। 'উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্' যার হৃদয় উদার, সমগ্র বিশ্বই তার আত্মীয়। বসুন্ধরায় কেবল মানুষেরই নয়, চরাচর সৃষ্টির সমাবেশ হয়ে থাকে। 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ', সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ'। অর্থাৎ সবাই সুখী হোক সবাই নিরাময় হোক। এই সবের মধ্যে কেবল ভারতীয়ই নয় বিশ্ব চরাচর সৃষ্টির সাথে পুরো বিশ্ব রয়েছে। এর তাৎপর্য হলো এই যে, ভারতের চিন্তাধারায় সর্বদাই বিশ্বায়ন রয়েছে। ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি অর্থনিষ্ঠ নয়, বরং ধর্মনিষ্ঠ, আর তাই ভারতের বিশ্বায়নও হচ্ছে সংস্কৃতিক।

আজ অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁচেছে যে ভারত আর্থিক বিশ্বায়নে ফেঁসে গিয়েছে। পশ্চিমের এই আর্থিক বিশ্বায়ন বিশ্বকে নিজের বাজারে পরিণত করতে চাইছে। কিন্তু যারা অর্থনিষ্ঠ তৈরি করে তারা অনাত্মীয় ব্যবহার করে থাকে। ভারতের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা বলেছেন যে, 'অর্থাতুরাণাং ন গুরুর্ন বন্ধুঃ'—যে অর্থের পেছনে ছোটে তার না থাকে গুরু না থাকে বন্ধু। এমন অনাত্মীয় সম্বন্ধের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা, হিংসা, সংঘর্ষ ও বিনাশই ছড়াতে পারে। পশ্চিমি দেশসমূহের অর্থনিষ্ঠা তাদেরও বিনাশের দিকে নিয়ে চলেছে। আমরাও যদি তাদেরই অনুসরণ করি তাহলে আমাদের পরিণতিও বিনাশই হবে।

পশ্চিমের বিশ্বায়ন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকেও গ্রাস করে ফেলেছে। পশ্চিমি সভ্যতা শিক্ষাকে একটি শিল্পে পরিণত করে তার একটি বাজার তৈরি করে ফেলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ও একটি কারখানায় পরিণত হয়েছে। আমরা সকলে শিক্ষার বাজারে শামিল হয়েছি। বিশ্বায়নের ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েছি। শিক্ষাই আমাদের অস্বাভাবিক এই বশ্যতার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। এটা বিচার করে বিশ্বায়ন ও শিক্ষা এই দুইয়ের সম্বন্ধে পুনর্বিচারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বিশ্বকেও বাঁচাতে হলে ভারতীয় সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নেরই প্রয়োজন পড়বে।

৪. রাষ্ট্র

রাষ্ট্র হচ্ছে একটি সাংস্কৃতিক পরিকল্পনা। আমরা পশ্চিমি বিচার প্রণালীর প্রভাবে পড়ে রাষ্ট্রকেই দেশ বলে থাকি এবং তাকে রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক একক রূপেই দেখে থাকি। রাষ্ট্র মূলত জীবন দর্শনকেই বলা হয়ে থাকে। জীবনদর্শন একজন নাগরিকেরই হয়ে থাকে। জগতে ভিন্ন ভিন্ন নাগরিক বা অধিবাসীর ভিন্ন ভিন্ন জীবনদর্শন রয়েছে। জীবন ও জগৎকে বোঝার বৈশিষ্টকে ওই অধিবাসীদের জীবনদর্শন বলা হয়ে থাকে। কখনও কখনও লোকে বলে থাকে সৃষ্টি তো একই আছে যেমনকার তেমন, একে বুঝবার পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন কী করে হতে পারে? সেইভাবেই জীবনও যেমনকার তেমনই রয়েছে, জনগণ তা ভিন্ন কীভাবে দেখতে পায়? তর্কের দৃষ্টিতে প্রশ্ন যদিও-বা ঠিক কিন্তু বাস্তবিকতার দৃষ্টিতে জনসাধারণের দর্শন ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে এটা সত্যি। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের অধিবাসীগণ জন্ম জন্মান্তরকে স্বীকার করে এবং অনেক জন্মের মাঝে জীবন একই হয়ে থাকে এই তথ্যে বিশ্বাস করে। যখন কিনা য়ুরোপের খ্রিস্টানরা জন্মান্তরে বিশ্বাস করে না। চরাচর সৃষ্টিতে একটি মূলগত ঐক্য রয়েছে—ভারতীয়রা এমনটা মানে, যখন কিনা য়ুরোপীয়রা ভিন্নতায় বিশ্বাস করে থাকে। অর্থাৎ জনগণের জীবন ও জগৎকে বোঝার দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এই ভিন্নতায় রাষ্ট্র একে অপরের থেকে পৃথক হয়ে থাকে।

ভৌগোলিক দৃষ্টিতে যা কিছু একে অপরের থেকে পৃথক তাকে মহাদ্বীপ তথা দেশ বলা হয়ে থাকে। সমুদ্রসমূহের কারণে যে ভূভাগ একে অপরের থেকে পৃথক হয় তাকে মহাদ্বীপ, আর পর্বত দ্বারা যারা বিভক্ত হয় তাদের দেশ বলে। উদাহরণ স্বরূপ, অস্ট্রেলিয়া হলো একটি মহাদেশ, অপর দিকে ভারত হচ্ছে একটি দেশ। এটা তার ভৌগোলিক পরিচয়। ভারত হলো একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক দেশ। এটা তার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়। এই পরিচয় তাকে রাষ্ট্রে পরিণত করে। রাষ্ট্রের রূপে এটা হচ্ছে একটা ভূসাংস্কৃতিক সত্তা। এর অর্থ হচ্ছে ভারতের ভূভাগ, ভারতের অধিবাসী এবং ওই অধিবাসীদের জীবনদর্শন মিলে রাষ্ট্র নির্মাণ হয়ে থাকে। এতে ভূভাগ কম-বেশি হয়ে থাকে। ভারতের ভূভাগ একসময় ইরান ও ইরাক পর্যন্ত ছিল। আজ তা জম্মু কাশ্মীর ও পাঞ্জাব পর্যন্ত রয়েছে। একটা সময় ছিল যখন ভারতে মুসলমান ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় ছিল না, কিন্তু আজ আছে। এতে ভারতের রাষ্ট্রীয়তাতে কোনো পার্থক্য বা ভেদাভেদ নেই। যতদিন জীবনদর্শন লুপ্ত না হচ্ছে ততদিন তা বজায় থাকে। যখন জীবনদর্শন ও তার অনুসরণে নির্মিত সংস্কৃতি বদলে যায় তখন ভূভাগ থাকলেও রাষ্ট্র থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান ইজরায়েল ১৯৪৮ সালে পৃথিবার মানচিত্রে ভূভাগ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এর আগে দু'হাজার বছর পর্যন্ত তাদের অধিবাসী ও জীবনদর্শন ছিল কিন্তু ভূভাগ ছিল না। তাদের রাষ্ট্র ছিল কিন্তু দেশ ছিল না। আজ গ্রিস তথা রোমের ভূভাগ রূপে আছে। কিন্তু প্রাচীনকালে যে রাষ্ট্র ছিল তা এখন আর নেই।

প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজস্ব একটা স্বভাব থাকে যা জন্ম থেকেই প্রাপ্ত হয়। এই স্বভাবই তার পরিচয় হয়ে থাকে। আমাদের জটিলতা হচ্ছে ,এই যে আমরা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সত্তাকে একই ভেবে থাকি। আমাদের রাজনৈতিক সত্তাই জানা আছে, সাংস্কৃতিক নয়। কিন্তু যুগে যুগে যা টিকে থাকে তা হচ্ছে সাংস্কৃতিক সত্তা। রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক নয়। ভারতকে একটি রাষ্ট্ররূপে রক্ষা করাই এখনকার অধিবাসীদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্র হচ্ছে এমন একটা ভৌগোলিক সীমা যেখানে অধিবাসীদের তার জন্য মাতৃস্নেহ থাকবে। এটাই হচ্ছে অধিবাসীদের মাতৃভূমি। এটাও সাংস্কৃতিক পরিচয়ই বটে।

৫. বৈজ্ঞানিকতা

বিশ্বায়নের মতোই বুদ্ধিজীবীদের জন্য বৈজ্ঞানিকতা হচ্ছে একটি লোভনীয় পরিকল্পনা। সবকিছুই বৈজ্ঞানিক হওয়া চাই। যা কিছু প্রক্রিয়া, পদ্ধতি, পদার্থ, বৈজ্ঞানিক নয়, তা পরিত্যাজ্য। বুদ্ধিজীবীদের অনুসরণ করে সাধারণ মানুষও বৈজ্ঞানিকতার অজুহাত দিয়ে থাকে।

কিন্তু এই বৈজ্ঞানিকতা কী? আজ যাকে বিজ্ঞান বলা হচ্ছে তা হচ্ছে ভৌত বিজ্ঞান। ভৌতবিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে যা পরীক্ষা করা হয় তাই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক। এই ফলাফলে যদি আমাদের উৎসব, বিধিবিধান, রীতিনীতি, অনুষ্ঠান প্রমাণিত না হয় তবে তা অবৈজ্ঞানিক। তাই পরিত্যাজ্য। তা অন্ধবিশ্বাস বলে প্রতিপাদিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের পারস্পরিক যজ্ঞগুলোতে ঘিয়ের অপচয় হয়। কোনো গরীব মানুষকে ঘি খাওয়ানো বরং এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর এমনটা বলা হয়ে থাকে। শিখা রাখা মূর্খতা অথবা অপ্রাসঙ্গিক এমন বলা হয়ে থাকে। এমন শত শত উদাহরণ আছে। এর মধ্যে অনেক অপূর্ণতা আছে এটা বোঝা দরকার। বিশ্বে শুধুমাত্র ভৌতিক পদার্থই নেই, ভৌতিকতার ঊর্ধ্বে অনেক বড়ো বিশ্ব রয়েছে। সেটা হচ্ছে মন ও বুদ্ধির জগৎ যা ভৌতিক জগৎ থেকে সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম বলতে লঘু বোঝায় না। সূক্ষ্ম বলতে অধিক ব্যাপক ও অধিক প্রভাবশালী বোঝানো হচ্ছে। মন ও বুদ্ধির বিশ্ব ভৌতিক বিশ্ব অপেক্ষা অধিক ব্যাপক ও অধিক প্রভাবী হয়ে থাকে। সমস্যা হচ্ছে এই যে আজকের বিজ্ঞান মন ও বুদ্ধির বিশ্বেও ভৌতিক বিশ্বের নিয়মাবলী প্রয়োগ করে থাকে। মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষা ভৌতিক বিজ্ঞানের ফলাফলের ওপর নির্মিত হতে তো আমরা দেখেইছি। এটা তো উলটো কথা। ভাবনা, ইচ্ছা, বিচার, কল্পনা, সৃজন ইত্যাদির বিশ্ব ভৌতিক বিজ্ঞানের মাপদণ্ডের থেকে অনেক ওপরে হয়ে থাকে।

একারণে আজকের বৌদ্ধিক বিশ্বের বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকতা অনেকটাই অসম্পূর্ণ। এটা কেবল অন্নময় ও প্রাণময় কোষেতেই প্রয়োগ করা যেতে পারে। মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষের ক্ষেত্রে এই ফলাফল অনেকটা খাটো হয়ে পড়ে।

ভারতেও বিজ্ঞান সভা আছে। এটা অনেক প্রতিষ্ঠিতও বটে। ভারতে বৈজ্ঞানিকতার অর্থ হচ্ছে শাস্ত্রীয়তা। শাস্ত্রসমূহের আধার অনুভূতির হয়ে থাকে। শাস্ত্র হচ্ছে আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধির আবিষ্কার। একারণে শাস্ত্র প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা রয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

''যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখম্ ন পরাম
গতিম্।। গীতা-১৬/২৩

অর্থাৎ যে শাস্ত্রের নির্দেশ উপেক্ষা করে স্বৈর আচরণ করে থাকে তার সুখ সিদ্ধি কিংবা পরমগতি প্রাপ্ত হয় না।

তিনি আরও বলছেন—''তস্মাচ্ছাস্ত্রম্ প্রমাণম্ তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ। ১৬/২৪

অর্থাৎ কী করা দরকার আর কী না করা দরকার এমন প্রশ্ন উঠলে তোমার জন্য শাস্ত্রই হচ্ছে প্রমাণ।

শাস্ত্র অর্থাৎ বিজ্ঞান। তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, বৈজ্ঞানিকতা তো ভারতেও প্রতিষ্ঠা রয়েছে। ওটা শুধু ভৌতবিজ্ঞানই নয়, বরং আত্মবিজ্ঞানের আলোক রচিত মন ও বুদ্ধির বিশ্বকেও ধারণ করবার বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিকতা। ইউরোপেও সাইন্সের অর্থ হচ্ছে শাস্ত্রীয়তা। আজ আমরা তাকে কেবল সংকুচিত করে ফেলেছি।

ভারতের বৌদ্ধিক জগতের এই দায়িত্ব হচ্ছে বৈজ্ঞানিক অন্ধ শ্রদ্ধাকে দূর করে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকতাকে সঠিক অর্থে প্রকাশিত করা। *(ক্রমশঃ)*

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

পাথর প্রস্তুত, রামমন্দির নির্মাণ শুধু সময়ের অপেক্ষায়

দুর্গাপদ ঘোষ

এখন থেকে ৩ বছর আগে ২০১৭ সালের ১৭ আগস্ট উত্তরপ্রদেশের নবনির্বাচিত বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বুক চিতিয়ে বলেছিলেন, ‘হিন্দু সমাজ জেগে উঠেছে। এখন আর রামমন্দির ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।’ অযোধ্যায় রামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণের সেই কাজ বস্তুত শুরু হয়ে গেছে। গত ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে ভূমি পুজো এবং ৪০ কিলোগ্রাম রুপোর ইঁটে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দু’সপ্তাহের মধ্যেই মাটি পরীক্ষার কাজ আরম্ভ হয়েছে। ২০ আগস্ট ‘রামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র

ন্যাস (অছি পরিষদ) জানিয়েছে যে এবার ভিত তৈরি হবে মাটির ৬০ ফুট গভীরে। পাথরে নকশা কাটার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছিল। কিন্তু ভূমিপুজোর প্রাক্কালে প্রস্তাবিত মন্দিরের আকার-আয়তনে কিছু পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। সে কারণে আরও কিছু পাথর খোদাই করা দরকার। সব মিলিয়ে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার থেকে ২ লক্ষ ঘনফুটের মতো পাথর লাগবে। তার মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার ঘনফুটের খোদাই সম্পন্ন। ২০২৩ সালের মধ্যেই মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

সোমনাথ মন্দিরের মতো এই রামমন্দিরও নির্মাণ করা হবে সম্পূর্ণ ভারতীয় স্থাপত্যকলা অনুযায়ী এবং প্রায় সোমনাথ মন্দিরের আদলে। তবে এই মন্দির নির্মাণের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, কোনোদিন মরচে ধরে ভেতর থেকে মন্দিরের যাতে ক্ষতি না হয় সেজন্য এতে কোনও লোহা ব্যবহার করা হবে না। বদলে ধাতু হিসেবে ব্যবহার করা হবে ২০ হাজেরর বেশি তামার পাত। সেইসব তামার পাত শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে যাঁরা দান করবেন তাঁরা পাতগুলোতে নিজেদের নাম খোদাই করে দিতে পারবেন। তামার পাতগুলো বসানো হবে কালো রঙের গ্রানাইট পাথরের অভ্যন্তরে।

রামজন্মভূমি মন্দিরের প্রধান স্থপতি হলেন বাস্তবিদ চন্দ্রকান্তভাই সোমপুরা। বর্তমান সোমনাথ মন্দিরও তিনিই নির্মাণ করেছিলেন। এখন তাঁর দুই বাস্তুবিদ পুত্র অনুভাই ও নিখিল সোমপুরা রামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণের দায়িত্বে রয়েছেন। দুজনেই জানিয়েছেন, ‘তামার পাতে নির্মিত একটা আধারের মধ্যে খোদিত থাকবে রামজন্মভূমি মন্দিরের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। সেই আধার রাখা হবে মাটির তলায়, ভিতের ঠিক পাশেই।’ রামজন্মভূমি মন্দির ধ্বংস করে বাবরি মসজিদ বানানো এবং প্রায় ৫৩ বছর যাবৎ পরিত্যক্ত সেই মসজিদ ধূলিসাৎ এবং রামমন্দির পুনরুদ্ধারকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ প্রায় ৫০০ বছর ধরে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির যে নোংরা খেলা চলে এসেছে ভবিষ্যতে কোনোদিন আর যাতে তার পুনরাবৃত্তি না হতে পারে সেজন্যই এই ইতিহাস বিধৃত করে রাখা হবে বলে জানিয়েছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই।

তাছাড়া প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে যাতে রামমন্দিরের অবস্থিতি সম্পর্কে সবাই একবাক্যে স্থিরনিশ্চয় হতে পারেন সেজন্য মাটির এত গভীরে গিয়ে প্রাথমিক ভিত বা বেসমেন্ট তৈরি করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে মন্দিরের দীর্ঘ স্থায়িত্বের ব্যাপারটা তো আছেই। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই প্রাথমিক ভিতের পাথরেও খোদিত থাকবে হিন্দু দেবদেবী এবং মঙ্গলঘট জাতীয় হিন্দুত্বের বিভিন্ন প্রতীকচিহ্ন। অনুভাইয়ের বক্তব্য অনুযায়ী নির্দেশ পাওয়ার ২৫ ঘণ্টার মধ্যে নকশা খচিত পাথর বসানোর যাবতীয় ব্যবস্থা প্রস্তুত। এখনো পাথর খোদাইয়ের যেটুকু কাজ বাকি রয়েছে, মন্দির নির্মাণের কাজ চলতে চলতে তা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

ইতিমধ্যে ভিত ও দোতলা পর্যন্ত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় পাথর কাটার কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। নকশাকাটা ২১২টা স্তম্ভ এবং অন্যান্য পাথর সযত্নে তুলে রাখা হয়েছে করসেবকপুরমের বিশাল ভাণ্ডারে বানানো ১৮৫টা বিমের তাকে। এখন সেগুলো পরিস্কার ও পালিশের কাজ চলছে। রাজস্থানের লাকিরামের মতো ১৬ জন দক্ষ কারুশিল্পী এখন নিরন্তর নকশা খোদাই করে চলেছেন। পাথরে নকশা কাটা শুরুর সময়

৬ জন কাজ করতেন। একটা সময় প্রায় ১০০ জন কাজ করছিলেন। কিন্তু এখন কেবলমাত্র সুদক্ষ (স্কিলড) নকশাকাররাই বহাল রয়েছেন।

রামজন্মভূমি মন্দির নিয়ে যত বিতর্ক, বিবাদ-বিসংবাদ চলতে থাকুক, ১৯৯০ সালের ১৭ মার্চ থেকে পাথরে নকশা কাটার যে কাজ শুরু হয়েছে এখনও তা চলছে। মাঝে দু'বার সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়েছিল কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টি (এম পি)-র রামমন্দির- বিরোধী রাজনীতির কারণে। প্রথমবার বন্ধ ছিল ২০০৮ থেকে ২০১১ সালে। রাজস্থানে গেহলট সরকার খনি আইনের অছিলায় সেখানকার মাটির নীচে থেকে পাথর তোলার ওপর বিষেধাজ্ঞা জারি করায়। দ্বিতীয়বার স্থগিত রাখতে হয় ২০১৫ সালের জুলাই থেকে ২০১৭ সালের মার্চ পর্যন্ত। তখন উত্তরপ্রদেশে ছিল সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদবের সরকার। রামমন্দিরের জন্য ট্রাক ভর্তি হয়ে পাথর আসছে দেখে তাঁর সরকার তা বন্ধ করার জন্য 'রামজন্মভূমি-বাবরি মামলা সুপ্রিম কোর্টের এক্তিয়ারে রয়েছে' এই বাহানা দেখিয়ে অযোধ্যায় পাথর নিয়ে আসার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। অবশ্য ২০১৭ সালের ১৯ মার্চ অখিলেশ সরকারকে উৎখাত করে মানুষ তার যথোপযুক্ত জবাব দিয়েছেন। যোগী আদিত্যনাথের সরকার বহাল হতেই সেই নিষেধাজ্ঞা বাতিল করা হয়। ফের পাথর আনানো শুরু হয়ে যায়। একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, পাথরে নকশা খোদাইকারীরা এত বছর ধরে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যাচ্ছেন। প্রতিদিন সকাল ৮টায় শুরু হয় তাঁদের ছেনি-হাতুড়ি ঠোকার কাজ। শেষ হয় রাত ৮টায়। দুপুর ১টা থেকে ২টো পর্যন্ত ভোজন ও বিশ্রামের জন্য অবসর। মোট ১২ ঘণ্টা কাজ করলেও মজুরি নিয়ে থাকেন ৮ ঘণ্টার। বাকি চার ঘণ্টা দিয়ে যাচ্ছেন স্বেচ্ছাশ্রম। যাকে তাঁরা রামমন্দিরের জন্য 'শ্রদ্ধাশ্রম' বলে থাকেন এবং এজন্য রোজ হাসিমুখে কাজ করেন।

পাথর কাটার কাজ প্রথম দিকে খুবই ধীর গতিতে কাজ চলত। তখন উত্তরপ্রদেশের মীর্জাপুর জেলার চুনার থেকে মাত্র কয়েক ট্রাক পাথরের চাঁই (স্ল্যাব) নিয়ে আসা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, এই পাথরও গুণমানে যথেষ্ট ভালো। হালকা লালচে রঙের এই চুনার পাথরেই সম্রাট অশোক সারনাথে অশোকস্তম্ভ তৈরি করিয়েছিলেন। বর্তমানে রামজন্মভূমি ন্যাসের প্রধান তথা দিগম্বর আখড়ার প্রধান মহন্ত নৃত্যগোপাল দাস এবং শ্রীচম্পত রাই যখন অর্থদানের বদলে পাথর দানের আহ্বান জানান তখন থেকে রাজস্থানের ভরতপুর জেলার বায়ানায় বংশীপাহাড়পুর থেকে রামভক্তরা হালকা লালচে রঙের বেলেপাথর পাঠাতে শুরু করেন। রাজস্থানের সিরোহীতেও বেলেপাথর পাওয়া যায় 'ঢোলপুর স্টোন' নামে পরিচিত। তবে বংশীপাহাড়পুরের পাথর অনেক উৎকৃষ্ট মানের। এই পাথরের একটা বিশেষ গুণ হলো, এর ওপর জল পড়লে ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায় এবং এই পাথর হাজার হাজার বছর টিকে থাকে।

১৯৯০ সালের ২ নভেম্বর মুলায়ম সিংহ যাদবের সরকারের বর্বরোচিত নৃশংসতায় যে সমস্ত নিরীহ করসেবকদের প্রাণ সংহার হয়েছিল তাঁদের স্মৃতি রক্ষার্থে অযোধ্যায় একাংশের নামকরণ করা হয়েছে 'করসেবকপুরম'। সেখানেই স্থাপিত হয়েছে 'রামজন্মভূমি ন্যাস কার্যশালা'। পাথর খোদাই এবং মজুত রাখা ছাড়াও সেখানে রক্ষিত আছে প্রায় ২ লক্ষ ৭৫ হাজার 'রামশিলা'। ১৯৮৯ সালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তত্ত্বাবধানে সমগ্র ভারত এবং বিশ্বের অনেক দেশে নানা ভাষার অক্ষরে 'শ্রীরাম' খোদিত রামশিলা (ইঁট) পূজনের কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল। প্রশাসনিক বহু নির্যাতন সহ্য করে স্থানে স্থানে পূজিত সেই শিলা অযোধ্যায় নিয়ে এসেছিলেন অদম্য মনোবলের করসেবকরা। এখন সেইসব শিলাও রামমন্দিরে ব্যবহার করা হবে।

সকলেই জ্ঞাত আছেন যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ১৯৮৮ সালেই রামজন্মভূমি মন্দিরের একটা সর্বসম্মত নকশা (মডেল) তৈরি করিয়েছিল স্থপতি শিরোমণি চন্দ্রকান্তভাই সোমপুরাকে দিয়ে। সেইমতো মন্দির হওয়ার কথা ছিল ২৬০ ফুট দীর্ঘ, ২৩৫ ফুট প্রস্থ এবং গর্ভগৃহের চূড়ার উচ্চতা হওয়ার কথা ছিল ১৪১ ফুট। গর্ভমন্দির ছাড়াও আরও ২টো দোতলা মণ্ডপ নির্মাণের কথা ছিল সেই মডেল। ঠিক ছিল মোট ২১২টা স্তম্ভের ওপর নির্মিত হবে গোটা মন্দির। কিন্তু গত ৫ আগস্ট ভূমিপুজো এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের প্রাক্কালে তার কিছু পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। এখন যে মন্দির হবে তার ক্ষেত্রফল হবে ১২০ একর। মন্দিরের দৈর্ঘ্য হবে ৩০০ ফুট, প্রস্থ ২৮০ ফুট এবং সঙ্গত কারণেই গর্ভমন্দিরের চূড়ার উচ্চতা ২০ ফুট বাড়িয়ে হবে ১৬১ ফুট।

গর্ভগৃহ ছাড়াও ধাপে ধাপে নির্মিত হবে আরও ৪টে মণ্ডপ। পুরো মন্দির হবে ৩ তলা। দেবদেবী যক্ষ-যক্ষিণী এবং মঙ্গল কলস ইত্যাদি নানা কারুকার্য খচিত মোট ৩২০টা স্তম্ভের ওপর নির্মিত হবে নতুন রামজন্মভূমি মন্দির। প্রত্যেকটা স্তম্ভের উচ্চতা হবে ১৬ ফুট করে এবং তাদের বেড় হবে ৬ ফুটের। প্রধান তোরণ হবে শ্বেত পাথরের। তোরণদ্বার ব্যতিরেকে মন্দিরে মোট ৫টা প্রবেশ দ্বার থাকবে। তার দুটো থাকবে সরযূ নদীর দিকে। বিগ্রহ রামলালাকে প্রদক্ষিণ করার জন্য গর্ভগৃহের চারিদিকে ১০ ফুট চওড়া পরিক্রমা পরিসরও থাকবে। মন্দিরের চূড়ায় শোভা পাবে সোনার কলস এবং তার ওপর সোনার ধ্বজদণ্ডের মাথায় ঝলমল করতে থাকবে প্রভাত সূর্যরশ্মির মতো সুবর্ণ-গৌরিক পতাকা। লাকি রামের মতো কারুশিল্পীরা দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে অন্তর থেকে বিশ্বাস করে এসেছেন যে একদিন না একদিন রামজন্মভূমি মন্দির মাথা তুলে দাঁড়াবেই দাঁড়াবে। রামলালা যেখানে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন সেখানে সুরমা মন্দিরে তাঁর পুনরাধিষ্ঠান ঘটবেই ঘটবে। যত বাধা বিপত্তিই আসুক একদিন সেসব কর্পূরের মতো উবে যাবে। রাতের অন্ধকার কেটে গিয়ে সূর্যের আলোর মতো একদিন রামমন্দিরের আত্মপ্রকাশ ঘটবেই। ভগবান ভক্তাধীন। রামভক্ত লাকিরামদের সেই মনোবাঞ্ছার বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। এখন আর হাতে বেশি সময় নেই। রামজন্মভূমি ন্যাস কার্যশালায় কে এল কে গেল, কে দেখল কে দেখল না এসব দিকে ভ্রূক্ষেপ করারও অবসর নেই তাঁদের। মাথা নিচু করে, দিনরাত একমনে ছেনি-হাতুড়ি চালিয়ে নিষ্প্রাণ পাথরের বুকে প্রাণবন্ত নকশা খোদাই করে যাচ্ছেন। ▮

বিশেষ প্রতিবেদন

বামপন্থীদের ফেসবুক বয়কট
গোয়েবলসীয় প্রচার ছাড়া কিছু নয়

অভিমন্যু গুহ

ফেসবুকের সঙ্গে বিজেপি-আরএসএসের আঁতাত নিয়ে এখন সোশ্যালমিডিয়া সরগরম। সিপিএম তো ১ সেপ্টেম্বর ফেসবুক বয়কটের ডাক অবধি দিয়ে দিয়েছে। এবং এখনও পর্যন্ত ফেসবুকেই তার জোরদার প্রচার চলছে। আশা করা যায়, ১ সেপ্টেম্বরও ফেসবুক জুড়ে বামপন্থীদের ফেসবুক বয়কটের ডাক উপচে পড়বে! মজা থাক, আসল কথায় ফেরা যাক। সম্প্রতি 'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল' নামে এক মার্কিন সংবাদপত্র এক প্রতিবেদনে প্রকাশ করেছে যাতে দেখানো হয়েছে, ফেসবুকের ভারতীয় প্রধান আঁখি দাস ফেসবুকের যে কর্মীরা ফেসবুক পোস্টে নজরদারি চালান, সেইসব কর্মীদের কাছে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা পাঠিয়ে বলেছেন এক বিজেপি নেতার একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে 'বিদ্বেষমূলক'

> **কমিউনিটি গাইডলাইন মেনে সংখাধিক্যের সুযোগের জোরে বামপন্থীরা এতদিন হয়কে নয় করেছে, কোথাও যেন সেই একাধিপত্যে এবার ঘা পড়েছে। তাই এবার নতুন খেলা নিয়ে তারা আসরে নেমেছে। ... কিন্তু দেখতে হবে গোয়েবলসীয় প্রচারের আড়ালে যেন বারবার বলা একটা মিথ্যে সত্য না হয়ে যায়।**

পোস্ট ফেসবুক থেকে না সরাতে। ফেসবুকের কমিউনিটি গাউডলাইন অনুযায়ী, কোনো বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যে কোনো বিদ্বেষমূলক প্রচার হতে দেখলে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেবে। প্রয়োজনে পোস্ট ডিলিটও করে দিতে পারে। আঁখি দাস পোস্ট ডিলিট না করার পেছনে যুক্তি দিয়েছিলেন এতে নাকি ফেসবুকের বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে।

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, যা ঘটেছে তার জন্য আন্তর্জাতিক আইন আছে, ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি আইনও যথেষ্ট কড়া। দেশের আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। রাহুল গান্ধী স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে বিজেপি-আরএসএসের সঙ্গে ফেসবুকের আঁতাত ও তার ফলে মিথ্যে খবর রটানো, ঘৃণা ইত্যাদি প্রচার করা নিয়ে বস্তাপচা অভিযোগ করলে রাহুলকে মনে করিয়ে দিয়েছেন নির্বাচনের আগে ভারতীয় নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্য চুরির ঘটনায় কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা ও ফেসবুকের ঘটানায় রাহুল গান্ধীর হাতেনাতে ধরা পড়ার কথা। এই ধরনের রাজনৈতিক চাপানউতোর চলতেই থাকবে, সেটা অস্বাভাবিক নয়। দেশের নিরাপত্তার মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও যখন রাজনীতির অঙ্গীভূত হয়, তখন এতো অতি স্বাভাবিক ঘটনা। সিপিএম ১ সেপ্টেম্বর ফেসবুক বয়কটের ডাক দিয়েছে, তাতেও আমাদের বলার কিছু থাকতে পারে না। গণতান্ত্রিক দেশে এই অধিকারটুকু সবার থাকা উচিত। কিন্তু আমরা একটা সাম্প্রতিক প্রবণতার দিকে একটু খেয়াল করার চেষ্টা করবো, তাতে করে এই বিষয়টা বোঝার একটু সুবিধে হবে।

আপনাদের স্মরণে থাকতে পারে একের পর এক বিধানসভায় বিজেপি যখন সাফল্য পাচ্ছিল, তার ওপরে ২০১৯-এর লোকসভায় বিজেপির বিপুল ভোটে জয়, তখন রাহুল গান্ধী ও তার সহযোগী বামপন্থী-সহ অন্য বিরোধী দলগুলি একযোগে চিলচিৎকার জুড়েছিল ইভিএম নাকি হ্যাক হচ্ছে। ফল ঘোষণার দিন তো অনেক পরের কথা, তার আগে ভোটের দিনই নানান, যাকে ফেসবুক মিম বলে, তাতে পড়ছিল। মিম অনেকটা ব্যঙ্গচিত্রের মতো, তবে কার্টুনের সঙ্গে সাধারণ তফাত হলো এতে বাস্তবের কোনো মিল থাকে না। অনেকটা কাল্পনিক ব্যঙ্গচিত্র বলা যেতে পারে। তবে এসব ক্ষেত্রে কাল্পনিক ব্যাপারটা সবসময় বিশুদ্ধ নির্দোষ থাকে না। মূলত মিথ্যা খবরের ওপর ভিত্তি করে বিদ্বেষ ছড়ানোরও চেষ্টা হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে। ভোটের দিন বামপন্থীরা উদ্যোগী হয়ে যে মিমগুলো শেয়ার করতেন তাতে গ্রাফিক্সের মাধ্যমে দেখানো হতো আপনি যেখানেই বোতাম টিপুন না কেন, ভোট পড়ছে কিন্তু বিজেপি প্রার্থীর অনুকূলেই। বামপন্থীরা এমন অভিযোগ সংসদীয় ক্ষেত্রেও করেছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিক ভাবে চ্যালেঞ্জ করলে কমিউনিস্ট দলগুলো পালানোর পথ পায়নি। সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন কমিশনের বালাই নেই, যা খুশি লিখে পার পাওয়া যায়। তখন কিন্তু ফেসবুক কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। কমিউনিটি গাইডলাইন বাক্‌স্বাধীনতার ধুয়ো তুলে অভিযোগ পার করে দেওয়া হয়েছে। তখন কিন্তু ফেসবুক-বিজেপি আঁতাত ছিল না।

মজার ব্যাপার হলো, বিজেপি যখন সাম্প্রাতিক বিধানসভা নির্বাচগুলিতে আর সাফল্যের মুখ দেখছে না, তখন কিন্তু আর ইভিএম কারচুপির প্রসঙ্গ উঠছে না— সংসদীয় ক্ষেত্রে তো বটেই, এমনকী ফেসবুক বিপ্লবীরা বিষয়টিকে হিমঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে।

আরও একটা বিষয় খেয়াল করলে লক্ষ্য করবেন, বিজেপির আইটি সেলের প্রতি এদের খুব রাগ। নরেন্দ্র মোদী যেমন ভারতকে ডিজিটালি স্বনির্ভর করে তুলতে চেয়েছিলেন, মূলত তাঁর দেখানো পথেই হেঁটে অমিত শাহ বিজেপি পার্টিকে আধুনিক করে তুলতে চাইছিলেন। তাই বিজেপির আইটি সেলের অবতারণা। রাহুল, বামপন্থী-সহ বিরোধীদের ধারণা হলো বিজেপির জয়ের মূল স্থপতি হলো এই আইটি সেল। আইটি

সেলের কর্মকর্তারাও তাঁদের এই ক্ষমতা সম্বন্ধে বোধহয় অবগত নন। ফেসবুক বিপ্লবী বামপন্থীরা নিজেদের এই আইটি সেলের প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করতে গিয়েই যত বিপত্তি ঘটিয়েছেন। বিষয়টি একটু খোলসা করি।

অতি সম্প্রতি করোনা মহামারীর কালে, আপনারা জানেন প্রধানমন্ত্রী কিছু কর্মসুচি নিয়েছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল কাঁসর বাজানো, প্রদীপ প্রজ্বলন করা— এগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু করোনার বিরুদ্ধে দেশ ঐক্যবদ্ধভাবে লড়ছে, তা বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান সারাদেশের মানুষ সাড়া দিয়েছিলেন, কিন্তু বামপন্থীরা পুরো বিষয়টি হাস্যকর খাড়া করার প্রচেষ্টায় সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে এক ধর্মীয় প্রচারের (পড়ুন হিন্দুধর্মের) পরাকাষ্ঠা হিসেবে প্রচার করে গিয়েছিল, তখন কিন্তু তাদের মনে হয়নি ফেসবুক আদতে বিজেপি-আরএসএসের দালাল। ২০১৮ সাল থেকে একের পর এক বিজেপির বরিষ্ঠ নেতৃবৃন্দ দীর্ঘ রোগভোগের কারণে প্রয়াত হন। তাঁদের মধ্যে যেমন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সর্বজনশ্রদ্ধেয় অটলবিহারী বাজপেয়ী , অরুণ জেটলি, সুষমা স্বরাজ প্রমুখ ছিলেন, যারা চিরদিন সংসদীয় রাজনীতিতে বামপন্থী তো বটেই বিরোধীদের সঙ্গেও সুসম্পর্ক রক্ষা করে এসেছেন, তাদের মৃত্যুতেও যে চূড়ান্ত নোংরামি, অশ্লীলতা আমরা ফেসবুকে দেখেছিলাম, তার বিন্দুমাত্র প্রতিবাদও কিন্তু সংসদীয় বামেদের পাওয়া যায়নি। সাম্প্রতিক করেনায় বিজেপি নেতারা করোনা আক্রান্ত হলে যেভাবে ফেসবুকে তাদের হেনস্তার শিকার হতে হয়েছিল, তখন ফেসবুককে বিজেপি-আরএসএসের দালাল বলে তো কারো মনে হয়নি। বরং বাক্‌স্বাধীনতার অজুহাতে এই ধরনের অসভ্যতা সামাজিক স্বীকৃতি পেয়ে গিয়েছিল।

৩৪ বছরের বামশাসনে হিন্দু-নিধন যজ্ঞ বা হিন্দুদের হেনস্থা কম কিছু হয়নি। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর বামপন্থীদের এই নীতিই অনুসরণ করছে। রাজ্যের মানুষ কিছুই জানতে পারেননি, কারণ মূলধারার সংবাদপত্র এ ব্যাপারে নিশ্চুপ । পরিস্থিতিটা খানিক পাল্টালো ফেসবুক সক্রিয় হবার পর। ফেসবুকে এই ধরনের সাম্প্রতিকালে হিন্দুরা আক্রান্ত হলে উঠে আসতে দ্বিধা করছিল না। আর এতেই গাত্রদাহ হলো বামপন্থীদের। তারা প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতা বলে নতুন শব্দবন্ধনীও আবিষ্কার করে ফেললেন দোষীদের আড়াল করতে। কমিউনিটি গাইডলাইন অনুযায়ী, ফেসবুকে কোনও ঘটনা সত্য না মিথ্যা তা নির্ধারণ করার চল রয়েছে, সংসদীয় গণতন্ত্রে বামপন্থা আজ গোটা ভারতবর্ষে ১ শতাংশ নেমে গেলেও ফেসবুকে তারা এখনও যথেষ্ট সক্রিয়। তাই কমিউনিটি গাইডলাইন মেনে সংখাধিক্যের সুযোগের জোরে বামপন্থীরা এতদিন হয়কে নয় করেছে, কোথাও যেন সেই একাধিপত্যে এবার ঘা পড়েছে। তাই এবার নতুন খেলা নিয়ে তারা আসরে নেমেছে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের সেই প্রতিবেদন তাদের সামনে সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে মাত্র। তাই আসল ঘটনাকে বিকৃত করার উদাহরণ নেহাত কম নেই। প্রকৃত ঘটনা সামনে আসুক এটা সবাই চাইবেন। কিন্তু দেখতে হবে গোয়েবলসীয় প্রচারের আড়ালে যেন বারবার বলা একটা মিথ্যে সত্য না হয়ে যায়। সুতরাং যাঁরা ফেসবুক বয়কটের যেমন ডাক দিয়েছেন সেই আহ্বান অব্যাহত থাক, কিন্তু প্রকৃত সত্যটা এবার বুঝে নেওয়া দরকার। ▌

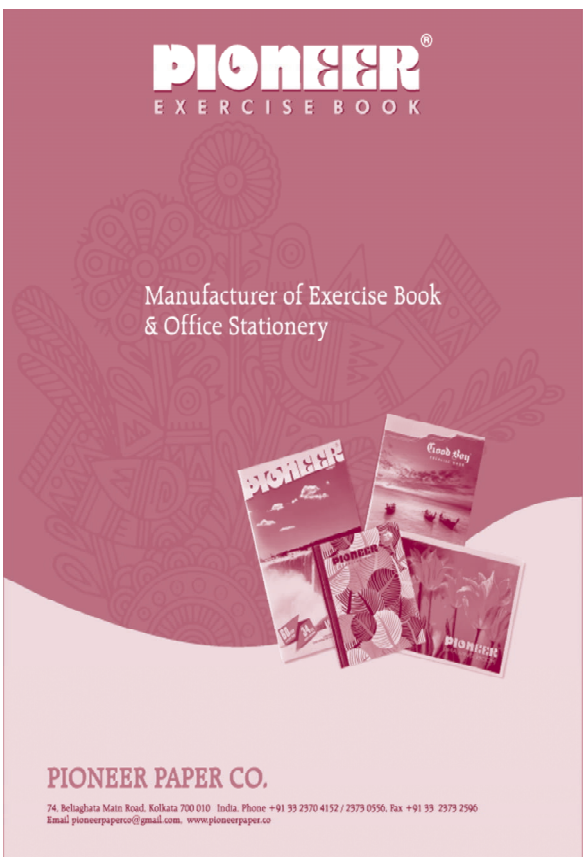

বিশেষ প্রতিবেদন

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতে শাসক-সমর্থিত দুষ্কৃতী তাণ্ডব

রামানুজ গোস্বামী

শিক্ষার আঙিনায় এই রাজ্যে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে প্রতিদিনই ঘটে চলে নানারকম ঘটনা। তাদের মধ্যে কোনোটা খবরে আসে, আবার কোনোটা-বা আসেও না। বিভিন্ন সময়ে এই সব ঘটনায় আমরা যথেষ্ট আন্দোলিতও হয়ে থাকি। কলেজ বা কোনো বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বিক্ষোভ, আন্দোলন, শিক্ষক বা অধ্যাপকদের সম্মানহানি করা ইত্যাদি এই রাজ্যে নতুন কোনও বিষয় নয়। তবে সম্প্রতি রাজ্যের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে গিয়েছে ভয়ংকর এক বিক্ষোভ তথা আন্দোলন, যা সারা পৃথিবীর কাছে লজ্জায় বাঙ্গালির মাথা হেঁট করে দিয়েছে। তার কারণ, এই বিশ্ববিদ্যালয়টির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ব্যক্তিত্বের নামটিই এক্ষেত্রে সব থেকে বড়ো বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— এই নামটি বলবার পরে আর কোনও ভূমিকার প্রয়োজন হয় না। বাঙ্গলা ও বাঙ্গালিকে যে কয়েকজন ব্যক্তিত্ব বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে একেবারে প্রথম সারির প্রথম কয়েকজনের মধ্যে অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, তিনি বিশ্বের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক। তিনি আমাদের আদর্শ জীবনবোধের সন্ধান দিয়েছেন যা আমাদের প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে সহায়তা করবে। শিক্ষা এই কাজে খুব বড়ো একটি ভূমিকা পালন করে। শিক্ষাঙ্গন, শিক্ষার আদর্শ পরিবেশ, মুক্ত চিন্তার এক ব্যতিক্রমী ও উদার প্রেক্ষাপট— এই সব কিছু নিয়েই সৃষ্টি হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের চিরন্তন কীর্তি তথা অমর সৃষ্টি--- বিশ্বভারতী। শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী এবং রবীন্দ্রনাথ যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে রয়েছে। শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাই আজও যেন রবীন্দ্রনাথ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন, এমনটাই মনে করা হয়ে থাকে। এই কারণেই আপামর বাঙ্গালির কাছেই শান্তিনিকেতন এক অনন্য স্থান; বিশ্বভারতী তাই সমস্ত ভারতীয় এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে শুধুমাত্র একটি পঠনপাঠন, গবেষণা ইত্যাদির কেন্দ্র তথা একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়মাত্র নয়, এটি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত এক তীর্থভূমি। যার আকর্ষণে দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য থেকে সাধারণ মানুষ, সকলেই ছুটে আসেন বারে বারে। এক অপরূপ তৃপ্তিবোধ করেন সকলেই। এখানকার দুইটি প্রধান উৎসব — পৌষমেলা ও বসন্তোৎসব ছাড়াও সারা বছরই বিশ্বকবির এই আশ্রমভূমিতে ভিড় থাকেন নানা স্থান থেকে আগত দর্শনার্থীরা।

লেখাটির এই পর্যন্ত পড়ে হয়তো বা কারও এটা মনে হতেই পারে যে, এটা কী রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতন সম্পর্কে কোনও প্রবন্ধ বা অন্য কিছু। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, এই ভূমিকাটুকুর প্রয়োজন ছিল এই কারণেই যে, অতি সম্প্রতি বিশ্বভারতীর অধিকারভুক্ত শান্তিনিকেতন পৌষমেলার মাঠে পাঁচিল তোলাকে কেন্দ্র করে যে ভয়ংকর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে এবং স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষের নামে যে সব বেপরোয়া কাজকর্ম হয়েছে, তাতে নিঃসন্দেহেই শান্তিনিকেতনের গরিমা তথা গৌরবের নিদারুণ হানি হয়েছে। বাঙ্গালি হিসেবে এই ঘটনা সারা পৃথিবীর কাছে লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট করে দেয়। মুখে রাবীন্দ্রিক আদর্শ এবং পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা বললেও এটা বুঝতে একেবারেই অসুবিধা হয় না যে, এই ঘটনার পিছনে রয়েছে রাজ্যের শাসকদলের সমর্থন কারণ, তা নাহলে এত বড়ো একটি সুসংগঠিত ধ্বংসাত্মক কাজ করা সম্ভব হয় না। সমস্ত টিভি চ্যানেলের দৌলতে এই ঘটনাটি আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করেছি। বহু পণ্ডিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিও এই কথা স্বীকার করেছেন যে, সেদিন (১৭ আগস্ট, ২০২০ সোমবার) যে উদ্ধত এবং দুর্বিনীত ভঙ্গিমায় মেলার মাঠের পাঁচিল, স্তম্ভ, গেট বা ফটক (যেগুলি বহু বছরের ঐতিহ্যের সাক্ষী ছিল) ইত্যাদি একেবারে লোডার বা বুলডোজার চালিয়ে তাণ্ডবের মাধ্যমে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, তা একেবারে বীভৎস একটি ঘটনা এবং শাসকের সমর্থন ছাড়া তা কখনই সম্ভব নয়। আমাদের রাজ্যের মহামহিম রাজ্যপালও এই ঘটনার অত্যন্ত নিন্দা করেছেন এবং দোষীদের যথাযোগ্য শাস্তির ব্যাপ্যারে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন। বলাই বাহুল্য যে, রাজ্য সরকার রাজ্যপালের কোনও নির্দেশ বা পরামর্শকেই গুরুত্ব দেয় না এবং এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম যে হবে না। যদিও এই ঘটনায় সামান্য কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তথাপি এটা তো প্রশ্ন থেকেই যায় যে, যে ঘটনায় কয়েক হাজার লোক উপস্থিত ছিল, তার মধ্যে মাত্র কয়েকজনকেই গ্রেপ্তার করাই কি

সারা পৃথিবীর কাছে বাঙ্গালি তথা সমস্ত ভারতবাসীর গর্বের সম্পদ হলো এই বিশ্ববিদ্যালয়। সেই প্রাঙ্গণে এই ঘৃণ্য ও বর্বরোচিত ভাঙচুর বাঙ্গালির ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি সম্মান বা রবীন্দ্রপ্রেমকে একেবারেই ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে।

যথেষ্ট? এই ঘটনায় অবশ্যই আরও বহুলোক জড়িত ছিল। তাদেরও গ্রেপ্তার করা আবশ্যক।

যে জমিটি বা মেলার মাঠ নিয়ে এত কথা, তা হলো বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ। তাই এই জমিতে যদি নিরাপত্তার স্বার্থে এবং অসামাজিক কাজকর্ম বন্ধ করবার জন্য বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ মাঠটি ঘিরে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তবে তা নিয়ে এত বিতর্কের কী কারণ আছে, তা তো বোঝা যায় না। বিশ্বভারতীতে এর আগেও পাঁচিল তোলা হয়েছে। কিন্তু তখন কোনো বিতর্ক তৈরি হয়নি। তর্কের খাতিরে যদি এটা ধরে নেওয়াও হয় যে, এতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের হানি হবে, তবে যে সব ব্যক্তির আপত্তি ছিল, সেই সব রবীন্দ্রপ্রেমী পরিবেশবিশারদরা আদালতের দ্বারস্থ হতেই পারতেন। তা না করে এই সব ব্যক্তি জবরদস্তির রাস্তাই বেছে নিয়েছিলেন। বোঝাই যায় যে, এই ঘটনায় অন্য কোনও স্বার্থও কাজ করেছে। তবে তা তদন্তসাপেক্ষ। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে বেশ কয়েকটি অভিযোগও দায়ের করেছেন। এই সব অভিযোগের সারাংশ প্রসঙ্গে এবারে আলোচনা করা যাক। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ সরাসরি যে অভিযোগগুলি করেছেন, তা এইরকম—

(ক) তৃণমূল নেতৃত্ব অর্থাৎ তৃণমূলের নেতারা এই ঘটনায় জড়িত।

(খ) পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে। পুলিশের তরফ থেকে সেদিন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে কোনও ভাবেই সহযোগিতা করা হয়নি।

এই ঘটনার পরে সাময়িক ভাবে বিশ্বভারতী সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে সমস্ত বিবরণ জানানো হয়েছে। কারণ তিনি বিশ্বভারতীর আচার্য।

বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, শাসকদলের বিধায়ক এবং অন্যান্য নেতারা সেদিন বিশ্বভারতী বিরোধী বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন। এমনটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশ্বভারতীর অধ্যাপক বিপ্লব রায়চৌধুরীর বাড়িতে পর্যন্ত দুষ্কৃতীরা অত্যন্ত বিপজ্জনক ভাবে ভাঙচুর করেছে। এছাড়া, বোলপুরের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রখ্যাত চিকিৎসক সুশোভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূর্তিতেও দুষ্কৃতীরা কালি লেপন করে দিয়েছিল। বোঝাই যায় যে, বিশ্বভারতীর বর্তমান উপাচার্যের কঠোর পদক্ষেপে কায়েমি স্বার্থান্বেষীদের স্বার্থে আঘাত লেগেছে। এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ে উল্লেখ করা অত্যন্ত আবশ্যক। এগুলি হলো যথাক্রমে—

(ক) বহু বছর ধরেই বিশ্বভারতী তথা শান্তিনিকেতন এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এত বিশাল খোলামেলা এলাকায় নানা দুষ্কৃতীর আনাগোনা রয়েছে। তাছাড়া, বিভিন্ন রকম অসামাজিক কাজকর্মও নিয়মিতই ঘটে চলে। এজন্য সুবিশাল এই আশ্রম ও বিশ্ববিদ্যালয়-চত্বরের বা এলাকার সুনির্দিষ্ট সীমারেখা থাকাটা একান্তই জরুরি।

(খ) বিশ্বভারতীর বহু জমি বেদখল হয়ে যাওয়ার কথাও বিভিন্ন আলোচনায় উঠে এসেছে।

(গ) রাজ্য সরকারের প্রায় সকল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের সীমানা সুচিহ্নিত করেছে সীমারেখা বা পাঁচিল ইত্যাদির দ্বারা। সেক্ষেত্রে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ যদি এই সীমানা সুরক্ষিত করবার কাজ করতে চান, তো তাতে আপত্তির কী থাকতে পারে?

(ঘ) এই ঘটনার পরে সম্প্রতি বিশ্বভারতীর উপাচার্য একটি খোলা চিঠিতে অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, সেদিনের ঘটনা পেশীশক্তির আস্ফালন ও প্রদর্শন ছাড়া অড্যা আর কিছুই নয়। কেউ কেউ আবার নিজেদের প্রাক্তনী পরিচয়ের অজুহাত দিয়ে সেদিনের গোলমালে অংশগ্রহণের পক্ষে যুক্তি দিতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও উপাচার্যের কথায় রয়েছে সমুচিত জবাব। তাঁর মতে, বিশ্বভারতীতে কেউ পড়লেই তিনি রাবীন্দ্রিক হয়ে যান না। তাছাড়া, ভূমিপুত্র হিসেবে চাকরির দাবিদার হয়ে যে অনেক অযোগ্য ব্যক্তি জোর করতে থাকেন— এটাও তাঁর কথায় স্পষ্ট। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উপাচার্য সরাসরি এই কথাই জানিয়েছেন যে, দুষ্কৃতীরা নিজেদের রাজনৈতিক নেতাদের সমর্থনেই এই ব্যাপক লুঠতরাজ ও ভাঙচুর করেছিল। তাঁর বক্তব্য থেকে আরও জানা যায় যে, পুরোনো পৌষমেলার মাঠে ৩০ বছর আগেই বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয় এবং কয়েক বছর আগে থেকেই ওই মাঠে সর্বসাধারণের যেমন খুশি প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হয়। উল্লেখ্য যে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সময়েই চীনা ভবন পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয় নিরাপত্তার কারণে। এছাড়া, গত বছরই আদালতের নির্দেশ মেনে চলবার কারণে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ পৌষমেলার সময়ে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তাই বোঝাই যায় যে, সাম্প্রতিক এই ঘটনাটি অত্যন্ত সুপরিকল্পিত। এই বিষয়ে উঠেছে সিবিআই তদন্তের দাবিও। বস্তুত সেক্ষেত্রেই একমাত্র নিরপেক্ষ তদন্ত হতে পারে।

রাজ্যে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তর থেকে এটা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এই পাঁচিল নির্মাণে আপত্তি রয়েছে এবং যে সব আন্দোলন, প্রতিবাদ ইত্যাদি হয়েছে ও হচ্ছে, তাকেও সমর্থন জানানো হয়েছে। এই বিষয়ে আরও একটি কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। তা হলো এই যে, এই ঘটনার পরেই বিশ্বভারতীর উপাচার্যের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে, যা আরও একবার প্রমাণ করে যে, এই ঘটনাতে শাসকদলের সমর্থন রয়েছে।

বিশ্বভারতীর নিরাপত্তার বিষয়ে বহুদিনই কেন্দ্রীয়বাহিনী, কেন্দ্রীয় সংস্থা ইত্যাদির বিষয়ে আলোচনা, দাবি পেশ ইত্যাদি হয়ে আসছে। এখন সময় হয়েছে যে, অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করুক এবং যারা এই বৃহৎ ষড়যন্ত্রের পিছনে রয়েছে, অবিলম্বে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করুক। অন্যথায় রবীন্দ্রস্মৃতি বিজড়িত এই বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক সমর্থনপুষ্ট দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য দিনে দিনে আরও বেড়েই যাবে। সেই সঙ্গে বাড়তে থাকবে অসামাজিক কাজকর্মও। পাশাপাশি যে সব ব্যক্তি রবীন্দ্রচিন্তার বিরোধী বলে এই পাঁচিল তোলাকে নিয়ে বিক্ষোভ তথা আন্দোলন প্রদর্শন করছেন, তাদের এটা বোঝা দরকার যে, যুগের পরিবর্তন, সমাজের মানসিকতার বদল ঘটে যাওয়ার কারণে এই সুবিশাল আশ্রমের তথা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তার স্বার্থেই প্রয়োজন সুদৃঢ় সীমারেখা দেওয়া— তাই একে অবহেলা করা চলে না।

শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় কর্মযজ্ঞের উদাহরণ। সারা পৃথিবীর কাছে বাঙ্গালি তথা সমস্ত ভারতবাসীর গর্বের সম্পদ হলো এই বিশ্ববিদ্যালয়। সেই প্রাঙ্গণে এই ঘৃণ্য ও বর্বরোচিত ভাঙচুর বাঙ্গালির ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি সম্মান বা রবীন্দ্রপ্রেমকে একেবারেই ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। এই প্রবন্ধের পরিসমাপ্তিতে তাই রবীন্দ্রনাথের কাছে অবনত হয়ে, তাঁকে প্রণাম জানিয়ে সেই প্রশ্নই করা উচিত, যা তিনি নিজে একদিন সর্বশক্তিমান ভগবানকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন—

"যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু,
নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ?
তুমি কি বেসেছ ভালো?"

বিশ্বভারতী কাণ্ডের উদ্যোক্তা ও সমর্থকদের জন্য রইল শুধু ছিঃ !

মণীন্দ্র নাথ সাহা

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গপ্রদেশের স্বর্ণযুগের এক ঐতিহাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সারা পৃথিবীতে ভারতবর্ষের উজ্জ্বলতম শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত কবিগুরুর বিশ্বভারতী। তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষার পরিবর্তে ব্যবহারিক প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মনোবিকাশের সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই এই প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা। আর সেই প্রতিষ্ঠানের ওপর দিয়েই বয়ে গেল শাসকদলের প্রসাদপুষ্ট জমি মাফিয়াদের ন্যাক্কারজনক ধ্বংসলীলা।

অতি সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের পৌষমেলার মাঠে পাঁচিল দেওয়াকে কেন্দ্র করে ঘটে গেছে এক লজ্জাজনক অধ্যায়। এই কলঙ্কিত অধ্যায়ে নাম জড়িয়েছে শাসকদলের বিধায়ক থেকে স্থানীয় নেতাদের। জেসিবি-র মতো আধুনিক যন্ত্র দিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বিশ্বভারতীর ঐতিহাসিক প্রবেশদ্বার। লোগার দরজার তালা ভেঙে শাসক দলের কর্মীরা লণ্ডভণ্ড করেছে বিশ্বভারতীর দপ্তর যা টিভির দৌলতে প্রত্যক্ষ করেছে গোটা বিশ্ব। অথচ অবাক কাণ্ড সাংস্কৃতিক মনস্কতায় পরিপুষ্ট এই রাজ্যের সুশীল সমাজ বা তথাকথিত বিদ্বজ্জনেরা মুখে কুলুপ এঁটে শীতঘুমে রয়েছেন। দেশের গর্বের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই লজ্জাজনক আক্রমণ ও ধ্বংসলীলার ঘটনা সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত হতেই নিন্দার ঝড় উঠেছে এই দেশ ছাড়াও বিশ্বজুড়ে। সমালোচনার মুখে পড়েছে শাসকদল।

বিশ্বকবির স্মৃতিবিজড়িত বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতন বাঙ্গালির কাছে তীর্থস্বরূপ। সেই তীর্থের যিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁর নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬৩ সালে রায়পুরের জমিদারের কাছ থেকে ভুবনডাঙার মাঠের কাছে ২০ বিঘা জমি কিনে নেন। ১৮৬৪ সালে তিনি এখানে একটি একতলা দালানবাড়ি তৈরি করে তার নাম দেন 'শান্তিনিকেতন'। এর ২৪ বছর পর ১৮৮৮ সালে দেবেন্দ্রনাথ একটি ট্রাস্ট ডিড তৈরি করে শান্তিকেতন আশ্রমটিকে সর্বসাধারণের জন্য উৎসর্গ করে যান।

১৯০১ সালের ২২ ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ পাঁচজন ছাত্র নিয়ে শান্তিনিকেতনে স্থাপন করলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়। সেখানে তিনি প্রাকৃতিক পরিবেশে লেখাপড়া শেখাতে চাইলেন ছাত্রদের। তাঁর পরীক্ষা স্বার্থক হলো। ধীরে ধীরে ওই বিদ্যালয় ডালপালা বিস্তার করে মহীরূহ হয়ে উঠল। ১৯২১ সালের ২৩ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হলো 'বিশ্বভারতী' সোসাইটি। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার অন্যতম লক্ষ্য ছিল শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আন্তর্জাতিক মানবতা বোধ গড়ে তোলা। বিশ্বভারতী হয়ে উঠবে বিশ্বমানের শিক্ষক্ষেত্র, এই আশা দৃঢ়ভাবে পোষণ করতেন কবি। জাতীয়স্তরে পরিচিতি লাভ করায়, ১৯৫১ সালে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বদা লাভ করে বিশ্বভারতী।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে জড়িয়ে আছে বহু বিশ্ববিখ্যাত মানুষের স্মৃতি। এখানে এসেছেন, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, নোবেল জয়ী অর্মত্য সেন, অস্কার পুরস্কারপ্রাপ্ত সত্যজিৎ রায়, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং আরও অনেকে। ছাতিমতলা, আম্রকুঞ্জ, পাঠভবন, সংগীত ভবনের মতো বিশ্বভারতীর ইতিহাসে জড়িয়ে আছে পৌষমেলাও। এই পৌষমেলায় অংশ নেওয়ার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তো বটেই বিশ্বের অনেক দেশ থেকেও বহু মানুষ আসেন। সে কারণে পৌষমেলা হয়ে ওঠে বিশ্বমেলা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এই মেলার মাঠ ঘেরা শুরু হতেই গোলমাল। শান্তিনিকেতনের অজস্র দ্রষ্টব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— রবীন্দ্রনাথের বাসগৃহ হিসেবে ব্যবহৃত ছটি বাড়ি— উত্তরায়ণ, উদয়ন, কোনার্ক, পুনশ্চ, উদীচী ও শ্যামলী। শ্যামলী তৈরির সময় ছিল পুরোপুরি মাটির। শান্তিনিকেতনের অন্যতম দ্রষ্টব্য হলো 'বিচিত্রা' ভবন যা রবীন্দ্র অনুরাগী পাঠক ও গবেষকদের কাছে অমূল্য সম্পদ। শান্তিনিকেতনের অন্যান্য দ্রষ্টব্যের মধ্যে আছে— কলাভবন, সংগীত ভবন, বিদ্যাভবন, শিক্ষা ভবন, বিনয় ভবন, চীনা ভবন, হিন্দি ভবন, পাঠ ভবন, সিংহ সদন, গ্রন্থাগার ও ছাতিমতলা।

বিশ্বভারতী থেকে বিশ্বকবির প্রাপ্ত নোবেল পদক চুরির ঘটনায় সারা বিশ্বের সামনে যেমন লজ্জায় বাঙ্গলার মাথা হেট হয়েছিল ঠিক তেমনি শাসকদলের সহযোগিতায় এবারে বিশ্বভারতীর নির্মীয়মাণ পাঁচিল ও ঐতিহাসিক প্রবেশদ্বার ধ্বংসের ঘটনায় আরও একবার বিশ্বজুড়ে কলঙ্কিত হলো এ রাজ্য। এ কলঙ্ক লেপন শুধু পশ্চিমবঙ্গের গায়ে নয়, বাঙ্গালির গায়ে নয়, এ কলঙ্ক লেপন হলো ভারতমাতার গায়েও। যারা এ কাজ করলেন এবং যাঁরা এ কাজকে সমর্থন করছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র একটি শব্দই উপহার দেওয়া যায়— 'ছিঃ'! ■

বেঙ্গালুরুর দাঙ্গা কী পূর্ব পরিকল্পিত?

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

জন্মাষ্টমীর প্রাক্কালে বেঙ্গালুরুতে দাঙ্গা করল মুসলমানরা। ঘটনার সূত্রপাত হয় স্থানীয় দলিত কংগ্রেস নেতা তথা এমএলএ অখণ্ড শ্রীনিবাস মূর্তিজীর নিকট আত্মীয়ের একটি ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে। ফেসবুক পোস্টে ওই ব্যক্তি মুসলমানদের নবির (মহম্মদের বয়স তখন বাহান্ন) ৬ বছর বয়সী আয়েশাকে বিয়ে করার ঘটনাকে মানবতাবিরোধী বলে উল্লেখ করে। তার আগে এক মুসলমান শ্রীকৃষ্ণকে লম্পট হিসেবে বর্ণিত করে চূড়ান্ত ভুল ও অশ্লীল ছবি পোস্ট করে। তার উত্তরে এই পোস্ট। মত প্রকাশের স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ ঘটনানোর অপরাধে মুসলমানদের অভিযোগের ভিত্তিতে তৎক্ষণাৎ ওই পোস্টকারী তথাকথিত দলিত হিন্দুকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কিন্তু গ্রেপ্তারের পরেও মুসলমানরা বিক্ষোভের নামে কয়েক হাজার কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট করে। দলিত-মুসলমান ঐক্য যে কতবড়ো প্রবঞ্চনা তা এই ঘটনা থেকে আরা একবার প্রমাণিত হলো। সেই পোস্টের অজুহাতে মুসলমানরা দলিত বিধায়কের বাড়িতে আক্রমণ করে এবং পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। ফায়ার বিগ্রেড এলে, মুসলমানরা সেই ফায়ার ব্রিগেডের গাড়িও জ্বালিয়ে দেয়। মুসলমানরা নিকটস্থ থানায় প্রবেশ করে এবং পুলিশের যানবাহনে অগ্নিসংযোগ করে, পুলিশ কর্মকর্তাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করে এবং থানায় লুটপাট চালায় যথেচ্ছ। প্রতিটি মুসলমান পাথর, ছুরি, পেট্রোল, কেরোসিন ইত্যাদি দিয়ে সুসজ্জিত ছিল। এক ঘণ্টার মধ্যে এইসব জোগাড় হলো কী করে? মুসলমানরা একের পর এক পথচারীদের থামিয়ে, নাম জিজ্ঞেস করে, বেছে বেঝে মেরেছে, অভিযোগ এমনটাই। পরিস্থিতি ১৪ আগস্ট পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে ছিল না। উগ্রপন্থী মুসলমানরা প্রতিবাদের নামে ব্যাপক ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুঠতরাজ ঘটিয়েছে। কয়েক হাজার গাড়ি, হিন্দুদের বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান-সহ ব্যাঙ্ক, এটিএম বুথ এমনকী হাসপাতালে পর্যন্ত হামলা চালিয়েছে মুসলমানরা। থানা ঘেরাও করে পুলিশের গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, কয়েকশো পুলিশ আহতও হয়েছে। এলাকায় জারি হয়েছে ১৪৪ ধারা। মুসলমানরা সংবাদ প্রচারের সময় মিডিয়াকেও প্রভাবিত করেছে। অবশ্য মিডিয়া এও বলছে যে, মুসলমানরা পুলিশ কোয়ার্টারে প্রবেশ করেছে এবং তাদের উপর আক্রমণও করেছে। মুসলমানরা ডিসিপির গাড়িতে আক্রমণ চালিয়ে চালককে গুরুতর আহত করছে। 'দেখামাত্র গুলি'র নির্দেশ

দেওয়া হয়েছে। তিন জন মুসলমান দাঙ্গাকারীকে গুলি করে মারা করা হয়েছে। আহত আরও বেশ কয়েকজন। গ্রেপ্তার ১৫০-এরও বেশি। ভারতের অন্যতম বৃহত্তম বাণিজ্যিক শহর বেঙ্গালুরু আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ১৪ তারিখ পর্যন্ত থেমে থেমে হিংসা চলেছে।

রামমন্দিরকে নিয়ে মুসলমান-বামপন্থী মিলে হিন্দুধর্ম নিয়ে প্রচুর আপত্তিকর মন্তব্য করেছে, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছে, ফোটোশপে অশালীন ছবি বানিয়েছে। খুব সামান্য কিছু ক্ষেত্রে যারা এই অপকর্মগুলো করেছে তাদের বাড়ি গিয়ে কিছু মানুষ নিন্দা জানিয়ে এসেছে, তাদের মা বাবাকে জানিয়ে আসা হয়েছে যেন ভবিষ্যতে এমন কাজ তাদের সন্তান দ্বিতীয়বার না করে। কারো গায়ে হাত তোলা হয়নি, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ বহু দূরের কথা। কিছুক্ষেত্রে পুলিশে জানানো হলেও পুলিশ কোনো একশন নেয়নি। অথচ হিন্দুধর্ম নিয়ে নোংরামি করা ওই ছেলে-মেয়েগুলি দুদিন পরেই আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের হিন্দুবিদ্বেষী নোংরামি শুরু করে। কারণ ওদের শেলটার দেওয়ার প্রচুর লোক জুটে যায়। উলটে যারা হিন্দুধর্ম অবমাননার অভিযোগে ওদেরকে সহবত শেখায়, তাদেরকেই মত প্রকাশে হস্তক্ষেপকারী হিসেবে থানায় মামলা দেওয়া হয়! এটা হিন্দুদের বিরুদ্ধে গ্লোবাল কন্সপিরেসির অংশ। অরাজকতা সৃষ্টি করো যেভাবে পারো মুসলমানরা সর্বাধিক অসহিষ্ণুতা করবে ও সহিংসতা চালাবে আর বাজারি দেশি সংবাদপত্র ও মুসলমান খ্রিস্টান-কবলিত পশ্চিমি প্রচারমাধ্যম তারস্বরে প্রচার চালাবে যে হিন্দুরা অসহিষ্ণু, তাতে করে ভারত ভাঙার কাজ ত্বরান্বিত হবে। নাইজেরিয়াতে একজন গায়ক ইমামকে নিয়ে বন্দনা করে গান বেঁধেছিলেন। কেন তিনি মহম্মদের প্রশংসা করে গান লেখেননি তার জন্য তার মৃত্যুদণ্ড হলো তাও আবার পাথর ছুঁড়ে।

বামপন্থীরা হিন্দুদের নিয়েই তাদের বিদ্বেষ প্রকাশ করে, মুসলমানদের দালালি করে। কারণ তারা জানে হিন্দুধর্ম নিয়ে নোংরা চুটকি লিখলে কিছু হবে না, বরং মুসলমানদের চোখে হিরো হওয়া যাবে। কিন্তু মুসলমানদের নবিকে একটু সম্মান দিয়ে না ডাকার অপরাধেই গর্দান হারানোর সম্ভাবনা আছে। তাই বেঙ্গালুরুর ঘটনায় বামপন্থীরা একটা শব্দও ব্যয় করেনি। হিন্দুরা জড় বস্তু তুল্য, তাই কোনো মিডিয়াও হিন্দুদের পাশে থাকে না। মুসলমানরা সংখ্যালঘু হয়েও হিন্দুদের নিরন্তর মাড়িয়ে যেতে পারে। হিন্দুদের ক্লীবত্ব এতটাই যে এই মাড়িয়ে যাওয়ার ব্যথা উপলব্ধি করার মতো শক্তিও তাদের নেই। অথচ সামান্য কৌতুক অভিনেতাও হিন্দু দেবদেবীদের নিয়ে সরেস মন্তব্য করে নির্দ্বিধায়, হিন্দু সাধুদের কলুষিত অশ্লীলতায়-আসক্ত বলে অভিহিত করেন। ফেসবুকে এক বামপন্থী নারীবাদী যুবতী বলেছেন যে, তারা রামমন্দিরে 'পেচ্ছাব' করতে ইচ্ছুক। এই ফেসবুকেই বামপন্থী বিকৃতমস্তিষ্করা বলেছেন, রামের চিতা জ্বালানো উচিত। ওয়েসি, আজম খান প্রমুখ মুসলমান রাজনীতিবিদরা সীতা, ভারতমাতা, গণেশ প্রভৃতি সম্পর্কে নিয়মিত অশ্লীল মন্তব্য চালিয়ে যান। জেএনইউতে ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত মা দুর্গাকে বেশ্যা বলা হয়। এসব তথাকথিত সেক্যুলার ও বামমার্গীদের ন্যারেটিভ। গণেশের গলায় জুতো পরানো হয়েছে। সেক্সি দুর্গা ছবির প্রযোজককে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন হিন্দু ধর্ম কী এতই ঠুনকো যে এতেই তা নষ্ট হয়ে যাবে। মকবুল ফিদা হুসেন এবং আকরাম খানের মতো মুসলমান চিত্রশিল্পীরা অবলীলায় মা সরস্বতী, শ্রীকৃষ্ণের নগ্ন, আপত্তিকর চিত্র আঁকেন। কিন্তু তাতে হিন্দুরা কখনও এজন্য দাঙ্গা করেনি।

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে কপিল সিব্বাল বলেছিলেন, রামমন্দির মামলার শুনানি হোক নির্বাচনের পরে। ওদের আশা ছিল যে, কংগ্রেস ক্ষমতায় আসবে আর রামমন্দির মামলার শুনানি ঠাণ্ডা ঘরে চলে যাবে। কিন্তু তা হয়নি, বরং ৩৭০ ও ৩৫-এ ধারা বিলোপ, ট্রিপল তালাক নিষেধ আইন সবই লোকসভায় গণতান্ত্রিক উপায়ে পাশ হয়েছে। রামমন্দির ইস্যু ন্যায্যমতো হিন্দুদের পক্ষে গেছে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে কথা চলছে। মাদ্রাসায় জিহাদের পরিবর্তে প্রগতিশীল শিক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সবশেষে এসেছে সিএএ, এনসিআর, এনপিআর— আর সহ্য করা যাচ্ছে না, এবার তাণ্ডব করো। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি পাথর ছুঁড়ে, আগুন জ্বালিয়ে মুসলমানরা নষ্ট করেছে। ইসলামি দেশ ও চীনের আর্থিক সহায়তায় ও কংগ্রেস-কমিউনিস্ট- আর্বান নকসাল-লিবারেল দুর্বুদ্ধিজীবী সবাইকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতে এটা হয়েছে। আগে থেকে সব মজুত ছিল। একটা সামান্য ছুঁতোয় তাণ্ডব চালাতে হবে। ওরা আমাদের টেস্ট করছে। শাহিনবাগ তো ট্রেলর ছিল, করোনা না হলে প্রতি শহরে শাহিনবাগ হতো। বেআইনিভাবে 'সেক্যুলার' শব্দটি কালাতিক্রান্ত লোকসভায় পাশ না করিয়ে ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থায় সংবিধানে ঢুকিয়ে দেন। সেই ঝুটা সেক্যুলাররিজমের বিষময় ফল ভুগতে হচ্ছে আমাদের। সংবিধান প্রণেতাগণ কখনোই সেক্যুলারিজম চাননি।

ভারতবর্ষে এটা নতুন নয়। পশ্চিবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় আসলেও সব সমস্যার সমাধান হবে না। ব্যাঙ্গালোরে বিজেপি ক্ষমতায় ছিল। কংগ্রেসিরা চিরকাল মুসলমানদের স্বার্থে রাজনীতি করেও তাদের বিধায়ক রক্ষা পায়নি। হিন্দুরা কোনো শিক্ষা নেয়নি, নিলে তবে বাজারি পত্রিকা এমন নিউজ করত না যে 'হিন্দুর একমাত্র দেশ ভারতে মুসলমানদের হাত থেকে হিন্দুর মন্দির রক্ষার জন্য মুসলমানরা মানব ঢাল তৈরি করেছে।' এর চেয়ে লজ্জাকর আর কী হতে পারে? এই নাটক পুরোটাই তাদের ধ্বংসযজ্ঞকে লঘু করার চেষ্টা। আক্রমণ কারা করেছিল, পাহারার দরকার হলো কেন? অথচ প্রত্যেকটি মিডিয়া এই নিউজটি বারবার প্রচার করছে। মুসলমানদের তাণ্ডবে ধ্বংসপ্রাপ্ত বেঙ্গালুরু শহরের চিত্র সেভাবে দেখাচ্ছে না। তবু নাকি ভারতে 'ভীত সম্প্রদায়' মুসলমান। তাই হিন্দুদের প্রাত্যহিক দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে ভয়ংকর দাঙ্গাবাজ হিসেবে চিত্রিত করা হয়। এই নরকের থেকে কবে মুক্তি মিলবে? ▮

জনগণের সঙ্গে সংযোগই নরেন্দ্র মোদীর সাফল্যের চাবিকাঠি

অতিথি কলম

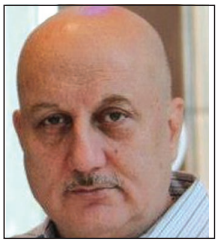

অনুপম খের

প্রধানমন্ত্রী মোদী যখন মজবুত ভারত গড়ার স্বপ্নকে সাকার করতে নিরলস এগিয়ে চলেছেন, তখন তাঁকে যাঁরা ঘৃণা করেন তাঁরা দিশেহারা হয়ে সেই বিশ বছর আগের অবস্থানেই অনড় থেকে খাবি খাচ্ছেন।

গত ৫ মাস ধরে কোভিডের তীব্র অগ্রগতি চলাকালীন ভারতের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি একটি বই লিখছি। আমি কিন্তু খোলামনেই সর্বদা কথা বলে থাকি। আমার বিশেষ নজরে পড়েছে রাজনৈতিক ফ্রন্টে মোদীর উপর্যুপরি সাফল্য। আস্থা—এটা কি নিয়তি, নাকি কঠিন পরিশ্রম? নাকি তুলনামূলকভাবে দুর্বল বিরোধীপক্ষ নিয়ে কাজ করার সুবিধে? আমি বেশ কিছু যুক্তি সন্ধান করেছি। সেগুলিই আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নেব।

মোদীর সমালোচকরা যে মোদীকে ঘৃণা করেন এটা বলতে ভালোবাসেন। তাঁরা এই সূত্রে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে মোদীর ওপর নানাবিধ গল্প তৈরি করেন যার মধ্যে থাকে বাছাই করা গালাগাল। একটু পিছিয়ে গিয়ে ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর যখন মোদী প্রথম গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হলেন তখন বিরোধীরা বলেছিল একটা বছর তার মধ্যেই মোদী হাওয়া হয়ে যাবেন। খুব তাড়াতাড়িই সেটা মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছিল। গুজরাটে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁকে একজন স্থানীয় নেতা হিসেবে গণ্য করা হতো। বড়োজোর স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব যাঁর গুজরাটের বাইরে কোনো স্বীকৃতি নেই। ২০১৩ সালের শীত বা ২০১৪-র বসন্তে 'Modi in unclectable' এই প্রকল্পটি গতি পায়। এই পথের প্রবক্তারা ২০১৪-র মে মাসের ফলাফলেই হতভম্ব হয়ে যান। ২০১৪-র পরবর্তী বছরগুলো এই পণ্ডিতরা এই আলোচনায় মগ্ন ছিলেন যে কিছু নয়, মোদী এক মেয়াদের আলটপকা প্রধানমন্ত্রী। তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে আনন্দ পেতে

যে এত ভালো গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসা সরকার কি কখনো দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফিরে এসেছে?

২০১৮ সালে ২৩ মে ব্যাঙ্গালোরের কংগ্রেস-জনতা (এস) দলের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে এক অনুপ্রাণিত দৃশ্যের অবতারণা হলো। মঞ্চের ওপর সারা ভারতের মোদী বিরোধীরা হাত ধরাধরি করে উদগ্র একতার প্রমাণ রাখলেন। হায়! ঠিক এক বছর পরে ২৩ মে ২০১১ নরেন্দ্র মোদীর আরও বেশি আসন নিয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতায় ফিরলেন। টীকা হিসেবে উল্লেখ করা যায় কর্ণাটকের এই বিষম মিলনের সরকার অভ্যন্তরীণ চাপে কয়েক মাস পরেই ভেঙে পড়ে।

এই ঘটনার পর থেকেই মোদী নিন্দুকরা আর একটি সান্ত্বনা ওষুধের সন্ধান পেয়েছেন। তা হলো টিএনএ দাওয়াই। মোদী কোনো বিষয় নয়, আসলে বিরোধিতা করার যোগ্য কেউ নেই তাই। তাদের চরম হতাশাব্যঞ্জক পর্যবেক্ষণ কেবল মোদীই পারেন মোদীকে হারাতে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে যতই মোদী শক্তিশালী হয়ে উঠছেন ততই তাদের বিভ্রম বাড়ছে। গণতন্ত্র কিন্তু কখনই এক মেরুর হতে পারে না। সেখানে যতই দুর্বল হোক না কেন একটি অন্য মেরুর আস্তিত্ব থাকতেই হবে। ভোট মেশিনে যখন নাম দেখা যায় তখন বহু নাম উঠে এসে বহুবিধ চিহ্ন নিয়ে প্রমাণ করে যে গণতন্ত্র কখনই বিকল্পহীন নয়। মোদী নিন্দুকরা সব ধরনের বিকল্প নেড়ে চেড়ে দেখতে কসুর করেনি। যে কোনো জাতি-প্রজাতির যেমন—বামপন্থী, জিহাদি, ব্যর্থ পরিবারতান্ত্রিক, অরাজক, বিচ্ছিন্নতাবাদী কাউকে সঙ্গে নিতে দ্বিধা করেননি। এমনকী আগে যারা মোদী ও আরএসএস-এর সঙ্গে কাজ করেছে তাদেরও টেনেছিল। ২০১৩ ও ২০১৮ সালে মোদীর নিজের দলেও বিকল্প নাকি চোখে পড়েছিল। তাই, যখন মোদী বিরোধীরা বলে কোনো বিকল্প পাওয়া যাচ্ছে না তখন তারা নির্ভেজাল মিথ্যে কথা বলে বা তাদের ব্যর্থতা জনিত বিষোদগার করে হতাশার প্রকাশ ঘটায়।

সত্যি কথাটা হলো সব ধরনের বিকল্পের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়ে গেছে। সেগুলিকে সাজিয়ে গুছিয়ে নানা মোড়কে ভোটারদের কাছে নিয়ে গেলেও তারা প্রত্যাখান করেছে। তারা বারবার মোদীর ওপরই বিশ্বাস ন্যস্ত করেছে। তারা জানে এই মানুষটির সঙ্গে তারা মানসিক যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে। মোদী সিদ্ধান্ত নিতে পিছপা হন না, দেশ ও তার মানুষের প্রতি তিনি নিবেদিত প্রাণ।

প্রত্যেক বিকল্প ভাবনা ব্যর্থ হয়েছে তার

মূল কারণ মানুষ জানে এরা কেউই মোদীর মতো মানুষের কাজে আসবে না। বিগত ৬ বছরে ভারতের ইতিহাসে সর্ব বৃহৎ দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প চালিয়েছেন মোদী। জনধন যোজনার ৪০ কোটি নাগরিক শুধু ব্যাঙ্ক খাতা পেয়েছে নয়, তারা এক পয়সা তছরূপ হওয়ার আগে পুরো প্রাপ্যটাই খাতায় পেয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত, পিএম কিষান, অটল পেনশন যোজনা, ফসল বিমার মতো আরও বহু জনহিতকর সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের গরিব জনতা একটা নির্ভরতা পেয়েছে। তাদের দারিদ্রে তলিয়ে যেতে হয়নি। সকলেরই জানা উচিত ১০ কোটি শৌচালয় তৈরি ও ৮ কোটি উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে গরিব পরিবারগুলিতে ধোঁয়াহীন চুল্লি সরবরাহ করা হয়েছে। কেবল গত বছরেই ২ কোটি পরিবারে নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে। ২০২৪-এর মধ্যে দেশের সব বাড়িতে জল পৌঁছনোর প্রকল্প রূপায়ণের পথে। মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্বের এই চলতি কার্যকালে ক্ষমতার অলিন্দে দুর্নীতির কোনো পূতিগন্ধ আজও পাওয়া যায়নি। প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত চুক্তিগুলি আর নির্দিষ্ট পরিবারতন্ত্রের সদস্যদের বেআইনি টাকা রোজগারের খিদে মেটায় না। বরং পুরো টাকাতেই ভারতের সেনাবাহিনীর সামরিক ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়। এই মোদীই এক সময় একজন সামান্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে গণ্য হতেন যাঁর বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে কোনো ধারণাই নাকি ছিল না এমন প্রচার তারস্বরে করা হয়েছিল। তিনিই 'India first'-এর আন্তর্জাতিক দর্শন নিয়ে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন।

এমন মানুষকে নিরীক্ষণ করতে হবে তাকে দেওয়া তথাকথিত বিকল্পগুলির মধ্যে কারা এতগুলি কাজ সুষমভাবে করতে পারবে। মানুষ দেখেছে কাশ্মীরের বন্যাবিধ্বস্ত মানুষের পাশে তাঁকে দাঁড়াতে। প্রত্যন্ত কাশ্মীর সীমান্তে সেনাবাহিনীর সঙ্গে দীপাবলির প্রদীপ জ্বালাতে। প্রবীণ জনজাতি রমণীর পা ধুইয়ে দিতে। বহু সাফাই কর্মচারীর তিনি পদ প্রক্ষালন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। মানুষ তাঁকে ঝাঁটা হাতে দেখেছে। দেখেছে লালকেল্লা থেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মেয়েদের ঋতুকালীন স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিতে। আজ ভারত মোদীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। তিনি ১৩০ কোটি ভারতবাসীর অন্তর্নিহিত শক্তির সর্বদা কদর করেন, কেননা তিনি সেটা উপলব্ধি করেছেন। ভারতের কোনো নেতা ক্রীড়া জগতের ব্যক্তিত্ব, শিল্পী, সংস্কৃতি পরিসরের তরুণ প্রজন্মকে আন্তরিকতায় ভরা চিঠি লিখে উৎসাহিত করেছেন? এমন নজির বিরল। ভারতের অসংখ্য পরিবারের সুখ-দুঃখের একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবে তিনি তাঁর জায়গা করে নিয়েছেন। এমন নেতার কি কোনো বিকল্প আছে? আমার জানতে খুব ইচ্ছে করে।

আমার বাবা আমাকে কৈশোরকাল থেকে শিখিয়ে ছিলেন যে তুমি যদি সত্যি কথা বলো তাহলে তোমায় সেটা মনে রাখতে হবে না। খেয়াল রাখতে হবে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সময় প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে কার্যরত। এই ক্ষেত্রে তিনি অতীত সমস্ত প্রধানমন্ত্রীকে ছাপিয়ে গেছেন। মুখ্যমন্ত্রিত্ব ও প্রধানমন্ত্রিত্ব এই যুগ্ম পদে তিনি একাদিক্রমে ১৯ বছর আসীন আছেন। এমন রাজনৈতিক সাফল্য ও তাঁর প্রতি মানুষের ভালোবাসা কেবলমাত্র বিরোধী হিসেবে উপযুক্ত লোক নেই— এই স্তোকবাক্যের মাধ্যমে বোঝানো যায় না। মানা তো দূরস্থান।

এই সাফল্যের কোনো মন্ত্রগুপ্তি নেই। সকলেই দেখছেন তিনি কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছেন। রাজনৈতিক চক্রান্ত ও কুৎসার প্রত্যুত্তর তিনি দিয়েছেন দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে। অবাক হওয়ার কিছুই নেই, মোদী যখন পূর্ণ আত্মবিশ্বাসে ভারত গড়ার স্বপ্নকে সাকার করতে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছেন তাঁর নিন্দুকরা তখনও সেই বিশ বছরের বস্তাপচা অবস্থানেই পড়ে আছেন— তাঁর বিকল্পব সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত ও হতচকিত। তারা শুধু হাতড়ে বেড়াচ্ছেন পরিত্রাণের উপায়। দেশবাসী নজরও করছে না।

(লেখক একজন প্রখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেতা এবং এফটিআইআই, পুনের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ)

শোক সংবাদ

মেদিনীপুর জেলার গোপালী শাখার স্বয়ংসেবক অসিত কুমার ভঞ্জ গত ২৬ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন।

তিনি ষাটের দশকের স্বয়ংসেবক। তৃতীয় বর্ষ শিক্ষিত। সঙ্ঘের মেদিনীপুর জেলা কার্যবাহ ও বিভাগ সম্পর্ক প্রমুখের দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৮৫ সালে মেদিনীপুরে সরস্বতী শিশুমন্দির তৈরি হওয়ার সময় থেকেই বিদ্যাভারতীর সঙ্গে যুক্ত। বেশ কয়েক বছর বিদ্যাভারতীর পূর্ণকালীন কার্যকর্তা হিসেবে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন। বিবেকানন্দ বিদ্যা বিকাশ পরিষদের প্রাদেশিক তথা কেন্দ্রীয় দায়িত্ব তাঁর ছিল। শেষদিন পর্যন্ত বিদ্যাবিকাশ পরিষদর অগ্রগতির জন্য সচেষ্ট ছিলেন। বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর স্বর্গত পিতা গোপালী আশ্রমের ভূমিদাতা।

বামপন্থা ও জিহাদি মৌলবাদের অত্যাশ্চর্য মিল

ড. তরুণ মজুমদার

ভ্লাদিমির লেনিনের একটি কথাকে তুলে ধরে বিভিন্ন ধরনের পোস্টার ও প্রচার আজকাল প্রায়শই দেখা যাচ্ছে। প্রচার চলছে, 'মার্কসবাদ সর্বশক্তিমান, কারণ ইহা সত্য।' হয়তো বিশ্বের নানা স্থানে মার্কসবাদের চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আপন তত্ত্বের মাহাত্ম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার তাড়না থেকে তা করা হয়। মার্কসবাদকে এইভাবে সর্বশক্তিমান হিসেবে ব্যাপক প্রচার করার বাকখিল্য সুলভ প্রচেষ্টার মধ্যে পরোক্ষভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহম্মদুর রসুলুল্লাহ'— এই আদর্শটিই পরিস্ফুট হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। অথচ কার্ল মার্কস নিজে কখনও তত্ত্বকে সর্বশক্তিমান হিসেবে দাবি বা প্রচার করেছেন বলে জানা নেই।

বিজ্ঞানে চরম সত্য বলে কিছু নেই। একটি বিশেষ সময়ে তখনকার তথ্য, জ্ঞান অনুযায়ী এবং যুক্তির সহায়তায় সেই সময়ে কোনো তত্ত্বকে সত্য বলে আংশিকভাবে স্বীকার করার অর্থ এটা কখনোই হতে পারে না যে অন্ধ ও দ্বিধাহীন ভাবে তাকে অপরিবর্তিত অবস্থায় আজও বয়ে চলতে হবে। ফলত, নতুনত্বের কোনোরূপ দিশা ছাড়াই নিজেদের আঁকড়ে রাখা কীট দংশিত তত্ত্বকে সর্বশক্তিমান হিসেবে গণ্য করার ফলেই প্রকৃতির অমোঘ নিয়মেই বামপন্থীরা মৌলবাদী চরিত্র অর্জন করেছে। সমাজের সমস্ত সমস্যার সমাধান একটি আদ্যন্ত জড়বাদী দর্শন করে ফেলতে সক্ষম, এই অবাঞ্ছিত ভাবনা বাস্তবতা থেকে শতসহস্র যোজন দূরে। একাত্ম মানবদর্শন ছাড়া কেবলমাত্র যান্ত্রিক বাস্তবতায় সমগ্রতা প্রতিফলিত হয় না। নানাবিধ পরস্পর বিরোধী সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয়-অর্থনৈতিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উপাদানের উপর অত্যধিক অসম গুরুত্ব আরোপ করে মার্কসবাদ বাস্তবিকই যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। শুধু এবং একমাত্র শ্রেণী সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই সমাজের রূপান্তর ঘটে বা এককথায় জড়বাদই সভ্যতার প্রাণশক্তি, এরূপ তত্ত্ব বাস্তব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ারই নামান্তর। কেবলমাত্র মার্কসীয় সরলরেখাকার দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজ বিবর্তনের এই তত্ত্ব অসম্বন্ধ প্রলাপ ব্যতীত আর কিছুই নয়। জড়বাদের প্রতি এই দ্বিধাহীন বিশ্বাস ও প্রশ্নহীন আনুগত্যই ধীরে ধীরে ভোগবাদ, ক্রমশ তা বৈষম্যবাদ ও শোষণবাদের জন্ম দেয় এবং পরিশেষে তা নির্লজ্জ সাম্রাজ্যবাদ বা বিস্তারবাদের দিকে অগ্রসর হয়। বর্তমান বৈশ্বিক রাজনীতিতে এরই প্রতিফলন দেখা দিচ্ছে। নিজেদের আঁকড়ে রাখা তত্ত্বকে সর্বশক্তিমান গণ্য করে, তার প্রতি চূড়ান্ত বশ্যতা, পরমত অসহিষ্ণুতা, হিংস্রতা, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বজুড়ে একের পর এক বামপন্থী মৌলবাদী চরিত্র সৃষ্টি করে চলেছে।

এই রাজনৈতিক মৌলবাদীদের মানসিকতা, আচার-আচরণের মধ্যে ইসলামি মৌলবাদীদের সাধারণ লক্ষণগুলো পরিলক্ষিত হয়। এরা ধর্মের স্থানে নিজের দলীয় রাজনীতিকে বসায়, ধর্মগ্রন্থের জায়গায় বসায় রাজনৈতিক দলিলপত্রকে। এদের দলীয় রাজনীতিকে যে বা যারা বিরোধিতা বা সমালোচনা করে, তাদের সঙ্গে খোলা মনে বিতর্কে না গিয়ে উগ্র ও হিংস্রভাবে বিরোধিতা করে। এরা রাজনৈতিক উদারতা থেকে সহস্র যোজন দূরে থাকে এবং ভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি ন্যূনতম সম্ভ্রম বোধ হারিয়ে ফেলে। দলীয় রাজনীতির প্রতি শৃঙ্খলা ও কেন্দ্রিকতার নামে দল ও নেতৃত্বের প্রতি প্রশ্নহীন বিশ্বাস ও সীমাহীন আনুগত্য প্রকাশ করতে থাকে। এমনকী দলের অভ্যন্তরে যেই কেউ কিছু প্রশ্ন তোলে বা সমালোচনা করে, তাকেই শ্রেণীশত্রু, প্রতিক্রিয়াশীল, পার্টি বিরোধী বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়। বিকৃত আদর্শ চাপিয়ে দেওয়ার রাজনীতির স্বার্থে হিংস্র শ্বাপদের ন্যায় আচরণ, খুন- জখম, সামাজিক বয়কটে শামিল হওয়া প্রকট হতে থাকে। ক্রমশ এরা সমাজকে মেকি শ্রেণীশত্রুতার নামে আড়াআড়ি দুই ভাগে ভাগ করে নেয়। হয় আপনি এদের দর্শনে বিশ্বাসী, না হয় আপনি প্রতিক্রিয়াশীল, চক্রান্তকারী বর্বর, যার সঙ্গে অত্যাশ্চর্যভাবে মৌলবাদী ইসলামি জিহাদিদের বিস্ময়কর মিল— হয় আপনি মুসলমান, না হয় কাফের।

যে কাফের শব্দটি আজকাল আমরা শতসহস্রবার শুনি, কোরানেই তার অর্থ পরিষ্কার করে বলা আছে (৫/৪৪)। এর অর্থ, যে কোরান মানে না অর্থাৎ অমুসলমান। বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘরগুলিতে উগ্র জিহাদি মৌলবাদীরা শুধুমাত্র তাদের ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস না রাখার কারণে এই কাফেরদের নির্বিচারে হত্যা করতে, গর্দানে আঘাত করতে বলে। সন্ত্রাসী আঁতুড়ঘরগুলিতে এই ধর্মান্ধ জিহাদিরা কচি কচি শিশু মনকে, বিশ্ব সৌভ্রাতৃত্বকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে, ক্রমাগত হিংসার বিষবাষ্পতে আর্দ্র করে তুলতে থাকে, যেখানে শেখানো হয়— তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে যদি না তোমরা এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমরা তাদের (কাফেরদের) সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকো যতক্ষণ না ধর্মদ্রোহিতা (ইসলাম বিরোধিতা) দূর হয় এবং আল্লাহর দ্বীন (ইসলাম) প্রতিষ্ঠিত না হয়। সেখানে অবিশ্বাসী (কাফের)-দের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে শেখানো হয়, যা মানব সভ্যতার ভ্রাতৃত্ববোধের মূলেই কুঠারাঘাত করে। জেহাদের নামে বিশ্বজুড়ে নিজ ধর্মবিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার তাড়নায় উগ্র মৌলবাদীরা যে দোষে দুষ্ট, ঠিক সেই একই কায়দায় বামপন্থী মৌলবাদীরাও সমাজে ভ্রান্ত জড়বাদী দর্শন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মেকি শ্রেণীশত্রুতার নামে সৌভ্রাতৃত্ববোধকে ধর্ষণ করে মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরি করতে সদা উদগ্রীব। হয় আপনি তাদের রাজনৈতিক দলিলগুলিকে দ্বিধাহীন আনুগত্যের জপমালা করে তুলুন, না হয় আপনি চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল, চক্রান্তকারী, কুচক্রী হিসেবে বিবেচিত হউন এবং আপনার ধ্বংসই হউক— এটিই মৌলবাদী বামেদের চরম মোক্ষ।

দেশমাতৃকাকে মাতৃরূপে স্বীকার করতে অস্বীকৃত হওয়া ইসলামি মৌলবাদী জিহাদি শক্তি এবং আদ্যন্ত জাতীয়তা বিরোধী মৌলবাদী বামেদের এই মিল হয়তো বা অবিশ্বাস্য এবং কাকতালীয়, এর কোনোটাই নয়। নিজ সুপ্রাচীন সমৃদ্ধিশালী ঐতিহ্যের প্রতি চরমভাবে অনুসন্ধিৎসু বর্তমান ভারতের নব প্রজন্মই না হোক এর যৌক্তিক বিচার করুক। প্রকৃতপক্ষে, একাত্মবাদী ভারতীয় সংস্কৃতিতে আপাত প্রভেদের মধ্যেই তার অন্তর্নিবিষ্ট ঐক্য বিদ্যমান। বহুমাত্রিক প্রভেদের মধ্যে বিরাজিত এই ঐক্যের সুরকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করার নোংরা ষড়যন্ত্রে একইসঙ্গে মেতে ওঠা বিজাতীয় বামপন্থী মৌলবাদ এবং বিশ্ব সৌভ্রাতৃত্বের শত্রু— উগ্র ইসলামি জিহাদি মৌলবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের শক্ত দেওয়াল তুলে ধরা আজ আশু কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ■

কমিউনিস্টরা ভারতের পক্ষে দুষ্ট ক্ষত

নিক্ষিপ্ত হচ্ছে কালের গহ্বরে

ডঃ আর. এন দাস

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে যত ভ্রষ্ট, লোভী ও নৃশংস নেতা হয়েছেন তার মধ্যে জ্যোতিবাবুর নাম সবার আগে থাকবে। ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা কাশ্মীরের দেশদ্রোহী ফারুক আবদুল্লা ২০১০ এ জ্যোতিবাবুর মৃত্যুর সময়ে বলেছিলেন, 'বাবার মতো জ্যোতিবাবু, আমাদের কাছে বিরাট অবলম্বন ছিলেন'। কাশ্মীরে ১৯৮৯ সালে যখন পণ্ডিতদের নরসংহার হচ্ছিল, ফারুক তখন লন্ডনে গলফ্ খেলায় এবং জ্যোতিবাবু ফিজিওথেরাপিস্ট দিয়ে ম্যাসেজ নিতে ব্যস্ত ছিলেন। বাংলাদেশ যুদ্ধজয়ের স্মৃতি হিসাবে ১৯৭১ সালে ফোর্ট উইলিয়ামে স্মারক-স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনার শুধু বিরোধিতা নয়, ১৯৯৯ সালে কারগিল যুদ্ধে শহিদ জওয়ানদের শব গ্রহণ করতে এবং তাঁদের হতভাগ্য বিধবাদের সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারও অস্বীকার করেন।

সাঁইবাড়ি, আনন্দমার্গী, বানতলা ও মরিচঝাঁপি হত্যাকাণ্ড জ্যোতিবাবুর সময়েই হয়েছিল। পদ্মশ্রী ও পদ্মবিভূষণ প্রাপ্ত বিশ্ববিখ্যাত সাঁতারু মিহির সেন ও তাঁর ব্রিটিশ স্ত্রী বেলা উইগার্টেন জ্যোতিবাবুর নির্বাচন প্রচারে শামিল না হওয়ায় সিটুর গুন্ডাদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যান। জ্যোতিবাবু ভাগ্যিস প্রধানমন্ত্রী হননি! তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হলে ভারত সাত ভাগে বিভক্ত হয়ে যেত। প্রাক্তন আইবি প্রধান অরুণ মুখার্জির আত্মজীবনীতে তাঁর দুর্নীতির কথা উল্লেখিত আছে। নিরীহ ও নিরস্ত্র তিব্বতীয়দের উপর জ্যোতিবাবুর পথনির্দেশক মাও সেতুঙ্গের নির্মম অত্যাচারের ঘটনা মেলিসা মাথিসনের হলিউড ফিল্ম 'কুন্দন' দর্শকের চোখে জল এনে দেয়।

জার্মান-ইহুদি কার্ল মার্ক্স ১৮৬৭ সালে ঘোষণা করেন, শোষক ধনীরাই দরিদ্রদের দুর্দশার কারণ। মার্ক্স রক্তক্ষয়ী বিপ্লব ও সমাজবাদের সাহায্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন। আকর্ষক এই বামৈশ্লামিক স্লোগান অবশ্যই শ্রুতিমধুর। দাঙ্গা ও ধর্ষণকারী জেহাদিরাও একই কথা বলে। মার্ক্সবাদ ও ইসলাম উভয়ই হিংসাত্মক উপায়ে বুর্জোয়া-ধনী ও প্রলেতারিয়েত-দরিদ্রের বৈষম্য মিটানোর অন্যতম পন্থা। কল্পলোকে স্বপ্নমগ্ন হয়ে বর্তমানের শান্তিময় সুন্দর পরিবেশকে ধ্বংস করার উন্মত্ততার মধ্যেই ওই দুই ইজমের' বীজ নিহিত। তাদের সঙ্গে তাত্ত্বিক তর্ক হলে, হয় মার খাবেন নয় মারা যাবেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে একথা বলছি। হাজার বছরের দাসত্বের পর দেশের রক্তক্ষয়ী বিভাজনে ঐতিহ্যময় ভারতের গৌরবশালী ইতিহাসে অনভিজ্ঞ প্রথম প্রধানমন্ত্রী দূরদৃষ্টিহীন 'পণ্ডিত' নেহরু পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং সোভিয়েত সাম্যবাদে বুঁদ হয়ে ছিলেন। স্বৈরাচারী শাসক লেনিন ও স্টালিনই ছিলেন তাঁর আদর্শ। রাশিয়ার সাম্যবাদ ১৯১৭ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত ১ কোটি নির্দোষ লোককে হত্যা করে। স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০০তে বলেছিলেন, মুসলমানরা ৪০ কোটি হিন্দুকে মুর্তিপূজার অপরাধে হত্যা করেছে। স্বাধীনোত্তর ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী ইসলামি পণ্ডিত মৌলানা আবুল কালাম আজাদের কাছে হিন্দুরা কী আশা করছিল? স্বাধীনতার পূর্বেই কমিউনিস্টরা ভারতের পক্ষে এক হানিকর দুষ্টক্ষতের মতো হয়ে উঠেছিল। নেতাজীকে তোজোর কুকুর এবং রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়াকবি বলা কমিউনিস্টরা ব্রিটিশদের হাতে অবলীলায় বিপ্লবীদের তুলে দিত। ১৯৪০ সালে মুসলিম লিগ ভারত বিভাজনের পরিকল্পনা করে। তাদের পাকিস্থান নামে ইসলামিক দেশের কল্পনা যা বাস্তবে গাজওয়া-ই-হিন্দের ব্লুপ্রিন্ট, তাকেই কমিউনিস্টরা অকুণ্ঠভাবে সমর্থন জানিয়েছিল।

আজ ইন্টারনেটের যুগে মাও ও মার্ক্সিস্টদের সত্যস্বরূপটি লোকের কাছে প্রকট হচ্ছে। আধুনিক আত্মনির্ভর ভারতে তারা আবর্জনার মতোই নিক্ষিপ্ত হবেন কালের গহ্বরে।

হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষকে আরও তীব্র করে তুলেছিল কমিউনিস্টরা। শক্তিশালী শত্রুকে বিধ্বস্ত করার ডিভাইড অ্যান্ড রুলের পদ্ধতি ম্যাসাডোনিয়ার দ্বিতীয় ফিলিপ থেকে শুরু করে, জুলিয়াস সিজার, নেপোলিয়ান, ম্যাকিয়াভেলি ও ইমান্যুয়েল কান্টও লিখে

গেছেন। আকবর ও নেহেরুও বাদ যায়নি ওই লিস্ট থেকে। ব্রিটিশদের কাছে শেখা ওই পদ্ধতির দ্বারাই ১৯৭৭ থেকে ২০০০ সাল জ্যোতিবাবু ২৩ বছর গদি আঁকড়ে ছিলেন। ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত ভারতে ৯৫ শতাংশ মুসলিম লিগ ও পাকিস্থানের সমর্থকরা ভারতেই থেকে যায়।

একদা মস্কোতে কমিন্টার্নের নেতা ফিলিপ স্প্র্যাট লিখেছেন, নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে ভারতের কমিউনিস্টরা অবৈধভাবে রাশিয়ার টাকা আত্মসাৎ করতো। মস্কোপ্রেমে মশগুল নেহেরু জেনেও কিছু বলতেন না। কমিউনিস্টরা রামজন্মভূমি বিবাদে সর্বদা বাবরপ্রেমীদের পক্ষে সমর্থন জানিয়ে হিন্দুদের সঙ্গে চরম শত্রুতা করেছে। স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যদিও তাদের অবদান ছিল না, কিন্তু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী তকমাধারীরা গত ৭০ বছর ধরে ভারতের শিক্ষানীতি ও শিক্ষাক্ষেত্রগুলি কবজা করে ভারতবিরোধী কাজকর্ম চালিয়ে এসেছে। তাদেরই একজন হিন্দুবিদ্বেষী প্রো-পাকিস্থানি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অমর্ত্য সেন ট্যাক্সহীন মাসিক ৫ লক্ষ টাকা বেতন নিতেন। সত্যের অপলাপকারী চীন ও রাশিয়ার মতোই ভারতের কমিউনিস্টরা মিথ্যার মোড়কে ইতিহাসকে শুধু বিকৃতি করেই ক্ষান্ত হয়নি; তারা মুঝে ফেলতে চেয়েছে আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের স্বর্ণময় গৌরব গাথাকে। বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত হয়েছে তাদের কাছে অচ্ছুত। বুদ্ধবাবুর মসজিদ নামক আঁতুড় ঘরের জেহাদিরা আজ সরস্বতী পুজার স্থলে নবি দিবস পালনের হুমকি দিচ্ছে মমতার ব্যানার্জির প্রশ্রয়ে। আমার মনে আছে, মাওবাদী লুম্পেন নকশালরা কীভাবে আমাদের স্কুলের অফিসঘর, লাইব্রেরি পুড়িয়ে ও স্বামীজির মূর্তিটাকে ভেঙ্গে দিয়েছিল।

ইংরেজরা যখন দেশ ছাড়ে সেসময়ও জিডিপির নিরিখে মহারাষ্ট্রের পরই পশ্চিমবঙ্গ ছিল সবথেকে উন্নত ও উর্বর ভূমি। দেশভাগের পর ধান ও পাটের সবচেয়ে উর্বর জমিগুলি বাংলাদেশে চলে যায়। গঙ্গাতীরে হাওড়ায় গড়ে উঠেছিল অসংখ্য জুটমিল। পূর্ববঙ্গের পাটের আমদানি বন্ধ হলে পাটজাত উৎপাদনও ব্যাহত হল। কারখানাগুলি ৭০ এর দশকে বাম জামানায় নিরন্তর ঘেরাও ও ধর্মঘটে বন্ধ হয়ে গেল। সত্তর হাজার কলকারখানার কঙ্কাল আজও দেখা যায় সেখানে। মেডিক্যালে পড়ার সময় আমি জুটশ্রমিকদের আকুপাংচার ও ফ্রি ওষুধ দিয়ে সেবা ক্লিনিক চালাতাম।

কংগ্রেস আমলে কিছু উন্নতি হয়েছিল। কল্যাণী ও দুর্গাপুরের শিল্পোন্নয়নে ছিল বিধানচন্দ্রের অবদান। টাটারা তাদের আর্থিক রাজধানী কলকাতায় আনতে চেয়েছিল, কারণ তাদের জামসেদপুরের খনিগুলি ২৭৮ কিমি. ছিল। ৬০-এর দশকে নকশালিদের হিংসাত্মক বিপ্লব দমনে অসমর্থ কংগ্রেসের কারণেই সিপিএম হিংসার রাজনীতি শুরু করে দেয় যা পরবর্তীকালে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। আজ যা গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচন জয়ের উপযুক্ত মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। লালুপ্রসাদ যাদব ও তাঁর সম্বন্ধী মুলায়ম সিংহ যাদব সিপিএমের কাছ থেকেই এই শিক্ষা নিয়েছিলিন। তাই গোপনে আঁতাত বজায় রেখে রাজ্যে ও কেন্দ্রে ৭০ বছর লুটমার জারি রেখে চলেছিল মুসলিম ও কমিউনিস্ট সমর্থিত এই সব আদর্শ ও নীতিহীন প্রাদেশিক দলগুলি। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের খেলায় বাজিমাত করেছিল সিটু। ফ্যাক্টারিগুলি এরাই বন্ধ করতো লাল সেলাম, ইন্‌কিলাব, ধর্মঘট, ঘেরাও ও বন্ধের মাধ্যমে। মালিককে ভয় দেখিয়ে, খুন করে, জোর করে টাকা আদায় করে এবং কারখানা বন্ধ করে বিপ্লব করতো। খিদিরপুর ও কলকাতা এয়ারপোর্টে সবথেকে বেশি মাল পরিবহণ করা হতো। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নের দৌরাত্ম্যে সেটা বন্ধ হয়ে গেছিল। কতিপয় হিন্দু শিল্পপতি মার্ক্সবাদের বিরোধিতা করায় বামনেতাদের চক্ষুশূল হয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভের সমীক্ষা থেকে জানা যায়, জ্যোতিবাবুর সময়েই পুরুলিয়া জেলায় দারিদ্র্য হার ছিল ৭৮ শতাংশ। বেকারত্বে পশ্চিমবঙ্গ ষষ্ঠ থেকে নেমে ১৭তম স্থানে এবং শিক্ষায় শেষের সারি তৃতীয় স্থানে পৌঁছেছিল। দুর্ভিক্ষের মাপকাঠিতে দৈনিক খাদ্যাভাবের পরিমাপে ওড়িশার ৪.৮ শতাংশ থেকেও জঘন্য ছিল পশ্চিমবঙ্গের ১০.৬ শতাংশ।

একসময় শিক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ সবার উপরে ছিল। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক থেকে ইংরেজি তুলে দিয়ে জ্যোতিবাবু বাঙ্গালির বেকারিত্বের হার অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে নেতারা নিজেদের ছেলে-মেয়েদের কনভেন্ট স্কুলে বা বিদেশে পাঠিয়ে ইংরেজি শিক্ষায় পারদর্শী করতেন। বাধ্য হয়ে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালি বেকার যুবকরা ইউনিয়নবাজদের ডাকা ধর্মঘটের শিকার হচ্ছিলেন। দুঃস্বপ্নের বাম জামানায় ৩৫ বছরে প্রতিটি পরিবারই রাজনৈতিক হত্যায় স্বজন হারানোর ব্যথায় ব্যথিত ছিল। বামনেতাদের অলস, অকর্মণ্য ও গুন্ডাপ্রকৃতির গুণধর পুত্রেরা অনুমোদনের জোরে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে রথারীতি স্থান করে নিত অনায়াসেই। স্বচেষ্টায় উঠে আসা মেধাবীরা রাজ্য ছেড়ে বিদেশে বা অন্য রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। ছাত্রাবস্থায় এই প্রতিবেদকও এস.এফ.আই-এর মস্তানির শিকার হয়েছিল। বামেরা ৮০-র দশকে অটোমেশন ও কম্প্যুটারের বিরোধিতা না করলে কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, গুজরাট নয়, পশ্চিমবঙ্গেই হতো সবথেকে বড়ো আইটি হাব খড়্গপুর আই. আই. টির কারণে। বামনেতারা ভোটের লালসায় বাংলাদেশি মুসলমানদের অবৈধ অনুপ্রবেশকে প্রশ্রয় দিয়ে আজ জনবিন্যাসে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছেন। নৃশংস ও নির্লজ্জ বামনেতারা ক্ষণস্থায়ী লোভের বশবর্তী হয়ে ভারতের সনাতন সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও ভাষাকে বিদেশি আক্রমণকারীদের হাতে নিগৃহীত করেছেন। ইতিহাসকে বিকৃত করার জঘন্য অপরাধ করেছেন।

পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপোষণ নীতিই ছিল ধোপাদুরস্ত ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত, চকচকে কালো পাম্পশু পরা, দাম্ভিক, কর্কশভাষী ও চোয়াল চেপে কথা বলা জ্যোতিবাবুর মস্তবড় গুণ। বাপ-কা-বেটা শুভব্রত ওরফে চন্দন বোসও দুটি বিয়ে করে কাশ্মীরে ডাক্তারি পড়া ও লন্ডনে ব্যবসায়ে অসফল হয়ে ইস্টার্ন বিস্কুট, গ্রিনফিল্ড হাউসিং এবং এয়ার ইন্ডিয়া

এক্সপ্রেসের কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ে বাবার নাম আরও উজ্জ্বল করে তোলেন। চিরকাল হিন্দুকলেজের সবথেকে পিছনের বেঞ্চের ছাত্র জ্যোতিন্দ্র ওরফে জ্যোতি চিকিৎসক বাবা ডাঃ নিশিকান্ত বসুর টাকায় লন্ডনে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীব রজনী পামদত্ত, হ্যারল্ড ল্যাস্কি ও হ্যারি পোলিটের সংস্পর্শে আসেন। আই.সি.এসে অকৃতকার্য হয়ে ১৯৪০ সালে দেশে ফিরে বাবা-মা'র আজ্ঞা অগ্রাহ্য করে আইনব্যবসার থেকেও লাভদায়ী জেনে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। মা-বাবার বিয়ের আদেশটি কিন্তু অগ্রাহ্য করেননি। সেই বছরেই বাসন্তীদেবীর সঙ্গে শুভপরিণয় হয়। দ্বিতীয় বিয়ে শ্যালিকা কমলার সঙ্গে ১৯৪৮ সালে হয়।

চীন-ভারত যুদ্ধের পরেই, ১৯৬৪ সালে সিপিএমের জন্ম হয়। আক্রমণকারী চীনের সমর্থক জ্যোতিবাবুই হন এই পার্টির কর্ণধার। এই রূঢ়ভাষী, নির্মম মুখবিশিষ্ট ও উদ্ধত বামনেতার ধামাধরা চামচেরা বলেন, উনি নাকি বর্গাদারি ব্যবস্থা করে ভূমিহীন কৃষকদের প্রভুত উপকার করেছেন। পঞ্চায়েতি রাজ নাকি তাঁরই অবদান। প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতিও নাকি তাঁর উর্বর মস্তিষ্কের ফসল। পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদগুলি ছিল সিপিএমের স্থানীয় অফিসঘর মানে বোমা ও প্রাণঘাতী ধারালো অস্ত্রের মজুদ ভাণ্ডার। অন্য দলের লোকেদের কোনো অধিকার ছিল না সেখানে। ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা ২০০৯ সালে স্বীকার করেন ২৭ শতাংশ বেনামি জমি সিপিএমের লোকেরাই ভোগ করতো। বেনামি অধিকৃত সম্পত্তিতে মসজিদ ও পার্টি অফিস বানানোই ছিল সিপিএমের প্রধান কাজ।

উন্নতমানের সেচ, সার, বীজ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ কিংবা ক্ষুদ্র উৎপাদিত খাদ্যশস্যের উপযুক্ত বাজারের ব্যবস্থা না করে, জোরজবরদস্তিতে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের ২.৫ একর বেনামি জমি দখল করিয়ে, সিপিএমের উর্দিহীন মুসলমান ও ক্যাডারভুক্ত ভাগচাষীদের মধ্যে বিলি করে জ্যোতিবাবু সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়েছিলেন ২০০০ সাল পর্যন্ত। সিপিএমের স্ট্যাম্পযুক্ত ঠিকাদার ও দালালদের ছিল রমরমা বাজার। সেসময় রাজ্যের রাজস্ব ঘাটতি পৌঁছেছিল ৭১০৯ কোটিতে। পূর্ববঙ্গ থেকে মুসলমামদের তাড়া খেয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে, বিনা পরিশ্রমে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিতে'পারদর্শী এই বামনেতারা শ্রেণীশত্রু ঘটিদের জমি দখল করে, ধর্ষণ ও হত্যার ভয় দেখিয়ে, সামন্ততন্ত্রীয় প্রথায় নিজেদের মৌবসীপাট্টা জমিয়েছিল।

১৯৭৮ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত অপারেশন বর্গা চালিয়ে ৪.১ লক্ষ হেক্টর জমি ১৪.৫ লক্ষ ভাগচাষির মধ্যে বণ্টন করে জ্যোতিবাবু অমর হয়েছেন। সংখ্যালঘু ভোটের জোরেই পরপর ৫টি নির্বাচনে ২৩ বছর রাইটার্সের গদিটি আঁকড়ে ছিলেন। প্রতিটি নির্বাচনে সংবিধান মেনে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিজ্ঞানভিত্তিক রিগিং, প্রতিপক্ষকে হত্যা ও ধর্ষণের ভয় দেখিয়ে, অপহরণ করে জয় তিনি সুনিশ্চিত করতেন। তারজন্য অবশ্য স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, অধ্যাপক, গবেষক , প্রশাসন এবং পুলিশের অকুণ্ঠ সমর্থন থাকতো। সিপিএমের নিজস্ব ক্যাডারদের দ্বারা তৈরি ছিল বেঙ্গল পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন। লুম্পেন চরিত্রের মদ্যপ এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই-এর গুন্ডাদের দিয়ে বিনাবাধায় শ্রেণীশত্রু ও বুর্জোয়া নিধন যজ্ঞের অপরাধমূলক কাজগুলি করাতেন। সিপিএমের 'সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি'র কমরেডদের দিয়ে দুপুরবেলায় দরজার ফাঁকে গণশক্তি ও দেশহিতৈষী ঢুকিয়ে, মাসের শেষে জোর করে চাঁদা তোলাতেন। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে পিওন নিয়োগের ভার থাকত এদের উপরই। হাইকোর্টের জজ,উকিল জ্যোতিবাবুর নাম শুনলে থরথর করে কাঁপতেন। চে গুয়েভারা বা মাওবাদীদের মতো জঙ্গলযুদ্ধে বিলাসী জীবন বিসর্জন দিতে চতুর বিপ্লবী জ্যোতিবাবু রাজি ছিলেন না। তাই তিনি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পার্লামেন্টের রাজনীতিকেই বেছে নিয়েছিলেন। ছুটি কাটাতে লন্ডনে গিয়ে স্কচ হুইস্কিতে মেতে থাকতেন। পঙ্কজ ব্যানার্জির কথায়, তিনি ছিলেন তরল গরল, বহুরূপী বামপন্থী; যখন যে পাত্রে রাখা হতো, তারই আকার ধারণ করতেন।

আমেরিকান কমিউনিস্ট নেতা ও লেখক হাওয়ার্ড ফাস্ট স্বৈরাচারী স্টালিনের জীবন অনুধাবন করে আক্ষেপের সঙ্গে ১৯৫৭ সালে তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'দ্য নেকেড গড'-এ লিখেছেন, 'এই দানবীয় ও তমোচ্ছন্ন শক্তিকে শুধুমাত্র শুদ্ধ ও সত্যের আলোকই দমন করতে পারবে। সমস্ত মানবজাতির পক্ষে বিশ্বাসঘাতক এই ইজম নিজের ধ্বংস ডেকে আনবে।' আজ ইন্টারনেটের যুগে মাও ও মার্ক্সিস্টদের সত্যস্বরূপটি লোকের কাছে প্রকট হচ্ছে। আধুনিক আত্মনির্ভর ভারতে তারা আবর্জনার মতোই নিক্ষিপ্ত হবেন কালের গহ্বরে। ■

বিশেষ আবেদন

বর্তমান করোনা মহামারীর ভয়াবহ পরিস্থিতিতে স্বস্তিকা মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। www.eswastika.com এতে ইন্টারনেট সংস্করণ নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে।

স্বস্তিকার সকল প্রচার প্রতিনিধি, পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি বিশেষ আবেদন, আপনারা স্বস্তিকার ইন্টারনেট সংস্করণটি আপনার পরিচিতদের মধ্যে হোয়াটস্অ্যাপ বা ই-মেলের মাধ্যমে পৌঁছে দিয়ে স্বস্তিকার প্রচারে আমাদের সহযোগিতা করুন। —*ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা*

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের

মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

ড. রাধাকৃষ্ণনের অনুভবে সনাতন হিন্দুধর্ম, সংস্কৃতি ও দর্শন

ড. তরুণ কান্তি চক্রবর্তী

১৯৬২ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ভারতে এবং ভারতের বাইরে শিক্ষক দিবস পালনের রীতি শুরু হয়। এই দিনটি বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক ও দার্শনিক ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন। এই দিনটিতে ভারতের বিজ্ঞান ভবনে স্বনামধন্য শিক্ষকদের ভারতের রাষ্ট্রপতি স্বহস্তে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন। ড. রাধাকৃষ্ণনের দার্শনিক চিন্তার মূল ভিত্তি ছিল ভারতীয় সনাতন ধর্ম, সংস্কৃতি ও দর্শন।

দক্ষিণ ভারতকে আমরা মানব মনীষার অন্যতম কেন্দ্র বলে থাকি। ভারতীয় সংস্কৃতিতে দক্ষিণ ভারতের অবদান অবিস্মরণীয়। নৃত্যকলা, শিল্পকলা, স্থাপত্য— সর্বত্রই দক্ষিণ ভারতীয়দের গৌরবজনক ভূমিকার কথা আমরা অবগত। রাধাকৃষ্ণন ছিলেন দক্ষিণ ভারতের এক সুসন্তান। তাঁর জন্ম মাদ্রাজ (অধুনা চেন্নাই) শহরের তিরুতানির এক মধ্যবিত্ত গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে। আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও এই পরিবারের লোকজন পড়াশোনা করতেন এবং ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে চর্চা করতেন। এই বাতাবরণের মধ্যেই রাধাকৃষ্ণনের

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। তারপর তিনি এলেন তিরুপতি শহরে। এই শহরটিও ধর্মকেন্দ্রিক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে প্রসিদ্ধ। ১৮৬৯ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সেখানকার খ্রিস্টান মিশনারি বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন এবং এখানে প্রথম পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার সংস্পর্শে এলেন। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে এলেন ভেলোর কলেজে। সেখানে ৪ বছর পড়াশোনা করলেন ; তামিল সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় আরও বাড়ল। এরপর দক্ষিণ ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী মাদ্রাজে তাঁর আগমন। রাধাকৃষ্ণনের জীবনীকাররা বলেন, তাঁর জীবন পরিক্রমায় কৈশোরের বছরগুলির আলাদা গুরুত্ব আছে। এ মন্তব্য বোধহয় স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ক্ষেত্রেও অনেকাংশেই সত্য। কারণ মনোবিদরা বলেন, মানুষের বড়ো হওয়া পিছনে পরিবেশ অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো অপ্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। নিজের জীবন আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ধার্মিক ব্রাহ্মণ পরিবারের পরিবেশ তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেছিল। তীর্থস্থানে থাকার দরুন তিনি ধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, খ্রিস্টান মিশনারি বিদ্যালয়ে ও মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার ফলে তাঁকে বাধ্যতামূলক ভাবে বাইবেল পড়তে হতো। এর ফলে তিনি খ্রিস্টধর্মের আকর্ষণ অনুভব করতেন। সেখানে মিশনারিরা কথায় কথায় হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করতেন। হিন্দু সভ্যতাকে এক ঘুমন্ত সভ্যতা হিসেবে চিহ্নিত করতেন। কিন্তু এ বিষয়টি তিনি মন থেকে মানতে পারতেন না। এই বিষয়টি তাঁর মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। জীবনের এই সন্ধিক্ষণে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের নামের সঙ্গে পরিচিত হলেন। কারণ, শিকাগোতে বিশ্বধর্ম সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ সনাতন হিন্দুধর্মের উপর যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা

সকলকে মুগ্ধ করেছিল। সনাতন হিন্দু ধর্ম বিশ্ববাসীকে যে অনেককিছু দিতে পারে তা তিনি গৌরবজনক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বিভিন্ন নামিদামি পত্রিকায় তাই স্বামী বিবেকানন্দকে বলা হলো— 'The Cyclonic Hindu Monk'। বিবেকানন্দের রচনাবলী তিনি পাঠ করলেন এবং সেগুলি তাঁকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করলো। তাঁর সমস্ত দ্বিধা দূর হয়ে গেল। তিনি বুঝলেন যে, হিন্দু ধর্মের ভিতর এমনকিছু মৌলিকত্ব আছে, যার আবেদন বিশ্বজনীন। তিনি এও উপলব্ধি করলেন যে, বেদকে কেন মানব-মনীষার আকর গ্রন্থ বলা হয়। তাঁর এই উপলব্ধির প্রথম সোনালি ফসল কিছুদিনের মধ্যেই পাওয়া যায়।

রাধাকৃষ্ণন যখন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে একটি মৌলিক প্রবন্ধ লেখার ব্যবস্থা ছিল। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তিনি লিখলেন, 'Ethics of Vedanta'। মাদ্রাজ খ্রিস্টান কলেজের অধ্যক্ষ জগ-সাহেব এই প্রবন্ধটি পড়ে আনন্দে অভিভূত হয়েছিলেন। ১৯০৮ সালে এই মৌলিক প্রবন্ধটি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। রাধাকৃষ্ণন পাশ্চাত্য ভাবধারায় কিছুটা উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু ভারতীয়ত্বকে কখনোই বিসর্জন দেননি। পরবর্তীতে অধ্যাপক ও দার্শনিক হিসেবে বিভিন্ন লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে এই ভারতীয়ত্ব— যার মূল শিকড় সনাতন হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে প্রোথিত, তা তুলে ধরেছেন।

ড. রাধাকৃষ্ণন যখন ছাত্র ছিলেন তখন পাঠক্রমে হিন্দু শাস্ত্র ও দর্শনকে গুরুত্ব দেওয়া হতো না। পড়ানো হতো পাশ্চাত্য ধর্ম ও দর্শনের বই। তাছাড়া খ্রিস্টান মিশনারিরা বলতেন হিন্দু ধর্মে নৈতিকতার কোনো স্থান নেই এবং জীবন সম্পর্কে কোনো বোধ নেই। রাধাকৃষ্ণন একথা সত্য বলে বিশ্বাস করতেন না। এর মধ্যে তিনি শ্রীঅরবিন্দের হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন লেখা ও ভাষণ অধ্যয়ন করেন। শ্রীঅরবিন্দ Inclusive Hinduism and Social Inclusion বিষয়ে যে মতামত রাখেন তা পড়ে তাঁর অনেক দ্বিধা দূর হয়ে যায়। শ্রীঅরবিন্দ হুগলী জেলায় উত্তরপাড়ায় ১৯০৯-এর ৬ মে ভাষণে বলেন, 'Other religions are preponderatingly religion of faith & profession, but the Sanatan Dharma is life it-self...'। শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস করতেন যে ভারতবর্ষ ও সনাতন ধর্ম এক ও অভিন্ন। তাঁর ওই ভাষণে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন, ''when...it is said that India shall rise, it is the Sanatan Dharma, that shall rise when it is said that India shall be great, it is the Santan Dharma that shall be great...''।

১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসে মাদ্রাজ কলেজের অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষকতার জীবন শুরু করলেন। খুব শীঘ্রই তিনি ছাত্রদের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। তাঁর আলোচনা ও অসাধারণ বাচনভঙ্গি সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত। তাই কৃতিত্বস্বরূপ ১৯১১ সাল তাঁকে 'লরিয়েট ইন টিচিং' উপাধি দেওয়া হয়। মাদ্রাজ কলেজের অধ্যাপনা জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে তিনি বলেন, ''...এই কলেজে আমি সাত বছর ধরে অধ্যাপনা করি। তখন আমি গীতা, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রগুলি পাঠ করেছিলাম। এইসব শাস্ত্রের উপর শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, লিম্বাৎ প্রমুখ আচার্যদের ভাষ্যগুলি পাঠ করি। বুদ্ধদেব যে বিশ্লেষণাত্মক ভাষণ এবং উপদেশ প্রদান করেছেন, হিন্দুধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে তার অন্তর্নিহিত অর্থ জানার চেষ্টা করি।''

১৯১২ সালে রাধাকৃষ্ণনের জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটলো। ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে পরিচিত হলেন। 'গীতাঞ্জলি' ও 'সাধনাকাব্য' পড়ে তিনি উপলব্ধি করলেন যে রবীন্দ্রনাথ শুধু একজন কবি নন, তিনি একজন ঋষি। তিনি এও উপলব্ধি করলেন যে, রবীন্দ্রনাথ ঋষির চোখ দিয়ে ভারতের সংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তীতে 'Quest' পত্রিকাতে ১৯১৭ সালের এপ্রিল ও জুলাই মাসে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনদর্শন ও সাহিত্যধর্ম সম্বন্ধে দুটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন। রবীন্দ্র-প্রতিভা মূল্যায়নে এই দুটি প্রবন্ধকে আমরা দুটি হীরকখণ্ডের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধ দুটি পাঠ করে একটি চিঠির মাধ্যমে রাধারকৃষ্ণনের প্রশংসা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, ''রাধাকৃষ্ণন এক তরুণ গবেষকের দৃষ্টিতে রবীন্দ্র দর্শনের অনুধ্যান করেছেন। তিনি একপেশে মতবাদ পেশ করেননি। নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিতে সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন।'' ১৯১৮ সালে 'Philosophy of Rabindranath Tagore' শীর্ষক তাঁর একটি বই প্রকাশিত হয়। সুখ্যাত প্রকাশন সংস্থা ম্যাকমিলন কোম্পানি এই বইটির প্রকাশক।

ধর্ম বিষয়ে বিশ্লেষণ তাঁর দর্শনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। 'Reign of Religion in Contemporary Philosophy' তাঁর একটি বিখ্যাত বই। এটি কতকগুলি প্রবন্ধের সংকলন। এই প্রবন্ধ সংকলনের শেষের দিকে 'উপনিষদ' থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। এই উদ্ধৃতিটি তাঁর দার্শনিক অভীক্ষার পরিচয় দেয়। রাধাকৃষ্ণন বিশ্বাস করতেন যে, আদিতসত্তার স্বরূপ বিকশিত করার জন্য উপনিষদ যেভাবে ক্রিয়াশীল থেকেছে, অন্য ধর্মগুলি তা করেনি। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ মানবজীবনের প্রাত্যহিক জীবনচর্যার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে এবং উপনিষদ জীবনচর্যা বাদেও মানবসত্তার অন্তরালে লুকিয়ে থাকা বিশ্বসত্তার সন্ধানে মগ্ন থেকেছে। এই পুস্তকটি পাশ্চাত্য জগতের পাঠক-পাঠিকার মধ্যে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বারট্রান্ড রাসেলের মতো বিশ্ববিখ্যাত মনীষী চিঠি লিখে রাধাকৃষ্ণনকে অভিনন্দিত করেছিলেন। পরবর্তীকালে রাধাকৃষ্ণন দেশে-বিদেশে শিক্ষাব্রতী হিসেবে অনেক স্মরণীয় বক্তৃতা দিয়েছেন। এমন কয়েকটি বক্তৃতার মূল বিষয়বস্তু এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। হিন্দুধর্মের সঙ্গে তাঁর দার্শনিক মানসিকতার যে নিবিড় সম্পর্ক তা তাঁর ম্যাঞ্চেস্টার কলেজে অ্যাপ্টন বক্তৃতায় ফুটে উঠেছে। সেখানে বলেন, ''হিন্দু জীবনদর্শন সম্পর্কে অ্যাপ্টন বক্তৃতামালায় আমি হিন্দু ধর্মকে একটি ঐতিহাসিক প্রগতিশীল

আন্দোলন হিসেবেই দেখতে চেয়েছি। এই সঙ্গে আমি বোঝাতে চেয়েছি যে, এই মুহূর্তে ওই আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির ধারা কিছুটা পরিবর্তিত হলেও এখনও তা বহমানা স্রোতস্বিনীর মতো বিদ্যমান। আমি আরও একটা কথা বলতে চাই যে, হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা নদীগর্ভের পলিমাটির কোনো অনড় পদার্থের রক্ষক নন, তাঁরা হলেন ধাবমান মশালধারী পথনির্দেশকের দল। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাঁরা চলতে পারেন। তবে অন্যায়ের সঙ্গে আপোশ করেন না।'' ১৯২৭ সালে অ্যাপ্টন বক্তৃতামালাতে প্রদত্ত ভাষণগুলি 'The Hindu view of life' নামে পুস্তক আকারে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত প্রকাশন সংস্থা জর্জ অ্যালেন দ্বারা প্রকাশিত হয়। রাধাকৃষ্ণন বিদেশের ভাষণগুলিতে জীবনবোধ উন্মোচনের বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। লন্ডন ও ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণগুলিকে কেন্দ্র করে 'An Idealistic view of life' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। এই ভাষণগুলির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি একজন অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দার্শনিক ছিলেন। এই ভাষণগুলির একটিতে তিনি বলেন, ''বর্তমান যুগে মানব আত্মার অবমানা চোখে পড়ছে। এখন রাজনীতি ও অর্থনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন ঘটে যাচ্ছে। যে কোনো প্রকারে মানুষ ক্ষমতা মুঠিবদ্ধ করার চেষ্টা করছে। দেখা গিয়েছে এক নব্য ঔপনিবেশিকতাবাদ। মানুষ আর শুধুমাত্র রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপন করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না। সে বৌদ্ধিক জগতে প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে। অন্যায়ভাবে অন্যের সৃষ্টিশীল ভাবনাকে আক্রান্ত করছে। এই অবস্থা বেশিদিন চলতে থাকলে, আমাদের সভ্যতার শেষের প্রহর ঘনিয়ে আসবে। এখন আমাদের উচিত হারানো আস্থাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা।...'' বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এবং ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে রাধাকৃষ্ণনের এই দূরদর্শিতার প্রমাণ মেলে। তাঁর এই দূরদর্শিতায় বিভিন্ন দিকের ও বিষয়ের বাস্তব অভিজ্ঞতার অবদান রয়েছে।

১৯৪৬ সালে ড. রাধাকৃষ্ণন UNESCO-এর সদস্য নির্বাচিত হলেন তাঁর পাণ্ডিত্য ও মেধার জন্য। এই সংস্থা আয়োজিত এক ভাষণে তিনি বলেন, ''আমাদের উচিত এমন এক আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির রূপরেখা নির্ধারণ করা যার সাহায্যে আমরা রাজনৈতিক হানাহানিকে দূরীভূত করতে পারবো।'' এরপর তিনি ১৯৪৮ সালে UNESCO-র চেয়ারম্যানের পদ অলংকৃত করেন। তখন কর্মব্যস্ততার মধ্যেও 'Religion and Society' নামে একটি বই রচনা করেন। এই বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন কীভাবে ধর্ম আমাদের সামাজিক নীতিকথাকে প্রভাবিত করতে পারে এবং কীভাবে ধর্ম ধর্মীয় অন্বেষণের মাধ্যমে সমাজ নীরব বিপ্লব সংঘটিত করতে পারে। তাঁর আরও বিশ্বাস যে, ধর্ম অন্বেষণের সঙ্গে সমাজ সংস্কারকেও যুক্ত করা উচিত। এছাড়া তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বিজ্ঞান মানুষকে বহুলাংশে নির্মোহী ও যুক্তিবাদী করে তোলে। বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারা ছাড়া কেউই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। ১৯৫২ সালে আমরা একজন শিক্ষক ও দার্শনিককে রাষ্ট্রনেতা হিসেবে তাঁকে পাই। উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি অসাধারণ বাস্তববোধ ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৫৬ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি তিনি লোকসভার কক্ষে গণতন্ত্র সম্বন্ধে একটি ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তিনি বলেন, 'গণতন্ত্রের আসল অর্থ হলো এমন একটি সরকার গঠন করা, যার হাতিয়ার হবে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি।' গণতন্ত্রকে তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমস্যা সমাধানের একমাত্র পন্থা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ১৯৬২ সালে তিনি রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হলেন। অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, 'দেশ তখনই সুখী হবে যখন রাজা হবেন দার্শনিক এবং দার্শনিক হবেন রাজা।' সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এই উক্তির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি রাষ্ট্রপতি হয়েই দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত রাষ্ট্রপতি দশ হাজার টাকা বেতনের মধ্য থেকে দু'হাজার টাকা রেখে বাকি টাকা দেশ গড়ার তহবিলে দান করতেন। আরেকটি সিদ্ধান্ত হলো যে, পূর্বে ভারতের বড়লাট গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাপনের জন্য সিমলায় যে বিলাসবহুল প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন তা উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। কারণ ওই ব্যয়বহুল প্রাসাদটির জন্য অকারণে মাত্র কিছুদিনের জন্য খোলা থাকলেও প্রচুর ব্যয় হতো। এই প্রসাদটি 'Indian Institute of Advanced Study' নামে একটি স্বয়ংশাসিত আবাসিক সংস্থা। এই সংস্থাটিকে আমরা ভারতীয় সারস্বত চিন্তার অন্যতম কেন্দ্র বলতে পারি। ১৯৬২ সাল ভারত-ইতিহাসে চীন-ভারত যুদ্ধের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। চীন-ভারত যুদ্ধে আধুনিক অস্ত্রের অভাবে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও ভারতীয় জওয়ানরা পরাজিত হয়েছিল।

যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য রাধাকৃষ্ণন অনেকাংশে নেহরুর অদূরদর্শিতাকে দায়ী করেছিলেন। নেহরু বিশ্বব্যাপী শান্তিস্থাপনের ব্যাপারে মত্ত থাকায় এবং চীনা মতলব বুঝতে ব্যর্থ হওয়ায় ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারেননি। এইজন্য ড. রাধাকৃষ্ণন নেহরুর নীতিকেই দায়ী করেছিলেন।

রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি বৌদ্ধিক জগতে ডুবে ছিলেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহ দুর্বল হতে লাগল। ১৯৭৫ সালে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে নার্সিংহোমে ভর্তি হলেন। তখনই তাঁর হাতে Templeton পুরস্কার প্রদান করা হয়। এই পুরস্কার বিশ্বমানবতার সঙ্গে যুক্ত মহান ব্যক্তিদের দেওয়া হয়। ছ'হাজার পাউন্ড মূল্যের এই পুরস্কার তিনি এক অনাথ আশ্রমকে দান করেন। ১৯৭৫ সালের ১৬ এপ্রিল রাত ১২-৪৫ মিনিটে তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। পরেরদিন ভারত-সহ সারা পৃথিবীর সংবাদপত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সম্মানের সঙ্গে তাঁর মৃত্যুখবর প্রকাশিত হয়। রাধাকৃষ্ণন আজ আর নেই, কিন্তু তাঁর জীবনাদর্শ, কর্মাবলী, ভারতীয় ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতিবোধ ভারতবাসীকে এক নতুন ভারত গড়ার দিক প্রদর্শন করবে। ■

SURYA

Energising Lifestyles

Innovative **DESIGN** » World-Class Quality **PRODUCTS** » Just One Name **SURYA**

lighting

fans

appliances

pipes

SURYA ROSHNI LIMITED

E-mail: consumercare@sroshni.com I www.surya.co.in

Tel.: +91-11-47108000, 25810093-96

Toll Free No.: 1800 102 5657

/suryalighting I /surya_roshni